নীললোহিত

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

কমলা বুক্ ডিপো, লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু—

নীল-লোহিত

আমাকে যখন কেউ গল্প লিখতে অনুরোধ করে, তখন আমি মনে মনে এই ব'লে দুঃখ করি যে, ভগবান কেন আমাকে নীল-লোহিতের প্রতিভা দেন নি সে প্রতিভা যদি আমার শরীরে থাক্‌ত, তাহ'লে আমি বাঙ্গলার সকল মাসিক পত্রের সকল সম্পাদক মহাশয়দের অনুরোধ একসঙ্গে অক্লেশে রক্ষা কর্‌তে পারতুম।

গল্প বল্‌তে নীল-লোহিতের তুল্য গুণী আমি অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিনি।

অনেক সময়ে মনে ভাবি যে, তাঁর মুখে যে সব গল্প শুনেছি, তারই গুটিকয়েক লিখে গল্প লেখার দায় হ'তে খালাস হই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সব গল্প লেখবার জন্যও লেখকের নীল-লোহিতের অনুরূপ গুণিপণা থাকা চাই। তাঁর বল্‌বার ভঙ্গীটি বাদ দিয়ে তাঁর গল্প লিপিবদ্ধ কর্‌লে সে গল্পের আত্মা থাক্‌বে বটে, কিন্তু তার দেহ থাকবে না। তিনি যে গল্প বল্‌তেন, তাই আমাদের চোখের সুমুখে শরীরী হয়ে উঠত এবং সাঙ্গো-

পাঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ করত। এমন খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার শক্তি আর কারও আছে কি না, জানিনে। কিন্তু আমার যে নেই, তা নিঃসন্দেহ। এ বর্ণনার ওস্তাদি ছিল এই যে, তার ভিতর অসংখ্য ছোট-খাটো জিনিষ ঢুকে পড়ত। অথচ তার একটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়, অসঙ্গত নয়, অনাবশ্যক নয়। সুনিপুণ চিত্রকরের তুলির প্রতি আঁচড় যেমন চিত্রকে রেখার পর রেখায় ফুটিয়ে তোলে, নীল-লোহিতও কথার পর কথায় তাঁর গল্প তেমনি ফুটিয়ে তুল্‌তেন। তাঁর মুখের প্রতি কথাটি ছিল, ঐ চিত্র-শিল্পীর হাতেরই তুলির আঁচড়।

তারপর কথা তিনি শুধু মুখে বল্‌তেন না। গল্প তাঁর হাত, পা, বুক, গলা সব একত্র হয়ে একসঙ্গে বল্‌ত। এক কথায় তিনি শুধু গল্প বল্‌তেন না, সেই সঙ্গে সেই গল্পের অভিনয়ও কর্‌তেন। যে তাঁকে গল্প বল্‌তে না শুনেছে, তাকে তাঁর অভিনয়ের ভিতর যে কি অপূর্ব্ব প্রাণ ছিল, তেজ ছিল, রস ছিল, তা' কথায় বোঝানো অসম্ভব। তিনি যখন কোনো ধ্বনির বর্ণনা কর্‌তেন, তখন তাঁর কানের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে মনে হ'ত যে, তিনি যেন সে শব্দ সত্য সত্যই স্বকর্ণে শুন্‌তে পাচ্ছেন। তাজি ঘোড়াকে ছারতকে ছাড়লে সে চল্‌তে চল্‌তে যখন গরম হয়ে ওঠে, আর তার নাকের ডগা যেমন ফুলে উঠে ও সেই সঙ্গে একটু একটু কাঁপতে থাকে, নীল-লোহিতও গল্প বল্‌তে বল্‌তে গরম হয়ে উঠলে, তাঁর নাকের ডগাও তেমনি বিস্ফারিত ও বেপথুমান হ'ত। আর তাঁর চোখ?—এমন অপূর্ব্ব মুখর চোখ আমি আর কোনও লোকের কপালে আর কখনো দেখিনি। গল্প বল্‌বার সময় তাঁর দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ থাকত, যেন সেখানে একটি ছবি ঝোলানো আছে, আর নীল-লোহিত সেই ছবি দেখে দেখে তার বর্ণনা ক'রে যাচ্ছেন। সে-চোখের তারা ক্রমান্বয়ে ডান থেকে বাঁয়ে আর বাঁ থেকে ডাইনে যাতায়াত কর্‌ত; যাতে ক'রে ঐ আকাশ-

পটের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তার সমগ্র রূপটা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর চোখের আড়াল না হয়, এই উদ্দেশ্যে। তারপর তাঁর মনে যখন তীব্র, কোমল, প্রসন্ন, বিষণ্ণ, সতেজ, নিস্তেজ ভাব উদয় হ'ত, তাঁর চক্ষুর্দ্বয়ও সেই ভাবের অনুরূপ কখনো বিস্ফারিত, কখনো সঙ্কুচিত, কখনো ত্রস্ত, কখনো প্রকৃতিস্থ, কখনো উদ্দীপ্ত, কখনো স্তিমিত হয়ে পড়ত। আর কথা তাঁর মুখ দিয়ে এমনি অনর্গল বেরত যে, আমাদের মনে হ'ত যে, নীল-লোহিত মানুষ নয়, একটা জ্যান্ত গ্রামোফোন। আর তাতে ভগবান নিজহাতে দম দিয়ে দিয়েছেন।

বন্ধুবান্ধবরা সবাই বল্‌তেন যে, নীল-লোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। যদিচ আমার ধারণা ছিল অন্যরূপ, তবুও এ অপবাদের আমি কখনো মুখ খুলে প্রতিবাদ কর্‌তে পারিনি। কেন না, এ কথা কারও অস্বীকার কর্‌বার যো ছিল না যে, বন্ধুবর ভুলেও কখনো সত্য কথা বল্‌তেন না। কথা সত্য না হ'লেই যে তা' মিথ্যা হ'তে হবে, এই হচ্ছে সাধারণতঃ মানুষের ধারণা; আর এ ধারণা যে ভুল, তা প্রমাণ কর্‌তে হ'লে, মনোবিজ্ঞানের তর্ক তুলতে হয়, আর সে তর্ক আমার বন্ধুরা শুন্‌তে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

লোকে নীল-লোহিতকে কেন মিথ্যাবাদী বল্‌ত জানেন? তাঁর প্রতি গল্পের hero ছিলেন স্বয়ং নীল-লোহিত, আর নীল-লোহিতের জীবনে যত অসংখ্য অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটেছিল, তার একটিও লাখের মধ্যে একের জীবনেও একবারও ঘটে না।

তাঁর গল্পারম্ভের ইতিহাস এই। যদি কেউ বল্‌ত যে, সে বাঘ মেরেছে, তা' হ'লে নীল-লোহিত তৎক্ষণাৎ বল্‌তেন যে, তিনি সিংহ মেরেছেন এবং সেই সিংহ-শিকারের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কর্‌তেন। একদিন কথা হচ্ছিল যে, হাতী ধরা বড় শক্ত কাজ। নীল-লোহিত অমনি বল্‌লেন যে, তিনি

একবার মহারাজ কিরাতনাথের সঙ্গে গাড়ো পাহাড়ে খেদা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েই "দায়দারদের" সঙ্গে তিনিও একটি পোষ-মানা "কুন্‌কি"র পিঠে চ'ড়ে বসলেন। তাঁর দুঃসাহস দেখে মহারাজ কিরাতনাথ হতভম্ব হয়ে গেলেন, কেন না, "দায়দাররা" জীবনের ছাড়পত্র লিখে, তবে বুনো-হাতী-ভোলানে ঐ মাদী হাতীর পিঠে আসোয়ার হয়। তারপর ঐ কুন্‌কি জঙ্গলে ঢুকতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড দাঁতলা,—মেঘের মত তার রঙ, আর পাহাড়ের মত তার ধড়, আর তার দাঁত দুটো এত বড় যে, তার উপর একখানা খাটিয়া বিছিয়ে মানুষ অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে। ঐ দাঁতলাটা একেবারে মত্ত হয়েছিল, তাই সে জঙ্গলের ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছগুলো শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে উপ্‌ড়ে ফেলে নিজের চলবার পথ পরিষ্কার ক'রে আসছিল। তার পর কুন্‌কিটিকে দেখে সে প্রথমে মেঘগর্জ্জন ক'রে উঠলো। তারপর সেই হস্তিরমণীর কানে কানে ফুসফুস্ ক'রে কত কি বল্‌তে লাগল। তার পর হস্তিযুগলের ভিতর সুরু হ'ল, "অঙ্গ হেলাহেলি গদ্‌গদ ভাব।" ইতিমধ্যে "দায়দাররা" কুন্‌কির পিঠ থেকে গড়িয়ে প'ড়ে তার পিছনের পা ধ'রে ঝুলছিল, আর নীল-লোহিত তার লেজ ধ'রে। এ অবস্থায় "দায়দারদের" অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল যে, মাটিতে নেমে চট্‌পট্ শোণের দড়ি দিয়ে ঐ দাঁতলাটার পাগুলো বেঁধেছেঁদে দেওয়া। কিন্তু তারা বল্‌লে, "এ হাতী পাগলা হাতী, ওর গায়ে হাত দেওয়া আমাদের সাধ্য নয়,—যদি রশি দিয়ে পা বেঁধেও ফেলি, তারপর যখন ওর পিঠে চ'ড়ে বস্‌ব, তখন সে দড়ি ছিঁড়ে জঙ্গলের ভিতর এমনি ছুটবে যে, গাছের ধাক্কা লেগে আমাদের মাথা চুর হয়ে যাবে।" এ কথা শুনে নীল-লোহিত "দায়দারদের" damned coward ব'লে, এক ঝুলে কুন্‌কির লেজ ছেড়ে দাঁতলার লেজ ধ'রে সেই লেজ বেয়ে উঠে তার কাঁধে গিয়ে চ'ড়ে বস্‌লেন। মানুষের গায়ে মাছি

বস্‌লে তার যেমন অসোয়াস্তি হয়, দাঁত্‌লাটারও তাই হ'ল, আর সে তখনি তার শুঁড় গুঁচালে ঐ নররূপী মাছিটাকে টিপে মেরে ফেল্‌বার জন্য। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নীল-লোহিত কি করেছিলেন জানেন? তিনি তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে উপুড় হয়ে প'ড়ে, দাঁত্‌লাটার কানে মুখ দিয়ে নিধুবাবুর একটা ভৈরবীর টপ্পা গাইতে সুরু কর্‌লেন, আর সেই মদমত্ত হস্তী অমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু নিমীলিত ক'রে গান শুন্‌তে লাগল। ঐ প্রণয়-সঙ্গীত শুনে, হাতী বেচারা এমনি তন্ময়, এমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল যে, ইত্যবসরে "দায়দাররা" যে তার চারটি পা মোটা মোটা শোণের দড়ি দিয়ে আটেঘাটে বেঁধে ফেলেছে, সে তা' টেরও পেলে না। ফলে দাঁত্‌লার নড়বার চড়বার শক্তি আর রইল না। সে হাতী এখন মহারাজ কিরাতনাথের হাতীশালায় বাঁধা আছে।

মহারাজ কিরাতনাথ কে?—এ প্রশ্ন করলে নীল-লোহিত ভারি চটে যেতেন। তিনি বল্‌তেন, ওরকম ক'রে বাধা দিলে তিনি গল্প বল্‌তে পারবেন না। আর যেহেতু তাঁর গল্প আমরা সবাই শুন্‌তে চাইতুম, সেই জন্যে পাছে তিনি গল্প বলা বন্ধ ক'রে দেন, এই ভয়ে ঐ সব বাজে প্রশ্ন করা আমরা বন্ধ ক'রে দিলুম। কারণ, সকলে ধ'রে নিলে যে—নীল-লোহিতের গল্প সর্ব্বৈব মিছে, ও-গল্প শোন্‌বার জিনিষ, কিন্তু বিশ্বাস করবার জিনিষ নয়। কেন না, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, নীল-লোহিত সতেরোবার ঘোড়া থেকে পড়েছিলেন, আর তার একবার দারজিলিংয়ে ঘোড়াশুদ্ধ দু' হাজার ফিট নীচে খাদে, অথচ তাঁর গায়ে কখনো একটি আঁচড়ও যায়নি, যদিচ পড়বার সময় তিনি স-ঘোটক শূন্যে দু'বার ডিগবাজী খেয়েছিলেন। নীললোহিত তিনবার জলে ডুবেছিলেন; যেখানে তীস্তা এসে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে, সেখানে একবার চড়ায় লেগে জাহাজের তলা ফেঁসে যায়, সকলে ডুবে মারা যায়, একমাত্র নীললোহিত পাঁচ মাইল জল

সাঁতরে শেষটা রোউমারিতে গিয়ে উঠেছিলেন। আর একবার মেঘনার জাহাজ ঝড়ে সোজা ডুবে যায়; সেবারও তিনি তিন দিন তিন রাত ঐ জাহাজের মাস্তলের ডগায় পদ্মাসনে ব'সে ধ্যানস্থ ছিলেন; পরে অন্য জাহাজ এসে তাঁকে তুলে নিলে। আর শেষবার মাতলার মোহানায় জাহাজ উল্টে যায়, তিনি ঐ জাহাজের নীচেই চাপা প'ড়েছিলেন, কিন্তু ডুব-সাঁতার কাটতে কাটতে তিনি ঐ জাহাজের হাল ধ'রে ফেল্লেন, আর ঐ হাল বেয়ে তিনি ঐ জাহাজের উল্টো পিঠে গিয়ে চ'ড়ে বস্লেন। ঐ উল্টোনো-জাহাজ ভাস্তে ভাস্তে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তারপর একখানা জার্ম্মাণ মানোয়ারী জাহাজ তাঁকে তুলে নেয়, আর সেই জাহাজেই Kaiser-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কাইজার নাকি বলেছিলেন যে, নীললোহিত যদি তাঁর সঙ্গে জার্ম্মাণীতে যান, তাহ'লে তিনি তাঁকে sub-marine-এর সর্ব্বপ্রধান কাপ্তেন ক'রে দেবেন। যে মাইনে কাইজার তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন, তাতে তাঁর পোষায় না ব'লে তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এ-সব নীললোহিতের কথা-বস্তুর নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করলুম, কিন্তু তাঁর কথারসের বিন্দুমাত্র পরিচয় দিতে পারলুম না। তুফানের বর্ণনা, সমুদ্রের বর্ণনা তাঁর মুখে না শুন্‌লে, গুণীর হাতে পড়লে জলের ভিতর থেকে যে কি আশ্চর্য্য রৌদ্ররস বেরয়, তা' কেউ আন্দাজ কর্‌তে পারবেন না।

নীললোহিতকে দিয়ে গল্প লেখাবার চেষ্টা করেছিলুম। কেন না গল্প তিনি আর বলেন না। তিনি আমার অনুরোধে একটি গল্প লিখেওছিলেন। কিন্তু সেটি প'ড়ে দেখলুম, তা' একেবারে অচল। সে গল্প প্রথম থেকে শেষ লাইন তক্ প'ড়ে দেখি যে, তার ভিতর আছে শুধু সত্য, একেবারে আঁককষা সত্য, কিন্তু গল্প মোটেই নেই। সুতরাং বুঝলুম যে, তাঁর দ্বারা আমাদের সাহিত্যের কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি কেন যে গল্প বলা ছেড়ে দিলেন, তার ইতিহাস এখন শুনুন।

বাঙলা যখন স্বদেশী ডাকাতি হ'তে সুরু হ'ল, তখন পাঁচজন একত্র হ'লেই ঐ ডাকাতির বিষয়ই আলোচনা হ'ত। খবরের কাগজে ঐরকম একটা ডাকাতির রিপোর্ট প'ড়ে, অনেকের কল্পনা অনেক রকমে খেলত। কথায় কথায় সে রিপোর্ট ফেঁপে উঠত, ফুলে উঠত। কেউ বলতেন, ছেলেরা একটানা বিশ ক্রোশ দৌড়ে পালিয়েছে, কেউ বলত, তারা তেতলার ছাদ থেকে লাফ মেরে প'ড়ে পিট্‌টান দিয়েছে। একদিন আমাদের আড্ডায় এই সব আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় নীললোহিত বললেন যে, "আমি একবার এক ডাকাতি করি, তার বৃত্তান্ত শুনুন।" তাঁর সে বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত লিখতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড উপন্যাস হয়, সুতরাং ডাকাতি ক'রে তাঁর পালানোর ইতিহাসটি সংক্ষেপে বলছি। নীললোহিত উত্তর-বঙ্গে এক সা মহাজনের বাড়ী ডাকাতি করতে যান। রাত দশটায় তিনি সে বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। এক ঘণ্টার ভিতর সেখানে গ্রামের প্রায় হাজার চাষা এসে বাড়ী ঘেরাও করলে, —ডাকাত ধরবার জন্য। নীললোহিত যখন দেখলেন যে, পালাবার আর উপায় নেই, তখন তিনি চট ক'রে তাঁর পণ্টনি সাজ খুলে ফেলে, একটি বিধবার পরণের একখানি সাদা-শাড়ী টেনে নিয়ে, সেইখানি মালকোঁচা মেরে প'রে, পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লোকে তাঁকে বাড়ীর চাকর ভেবে আর বাধা দিলে না। একটু পরেই লোকে টের পেলে যে, ডাকাতের সর্দ্দার পালিয়েছে, অমনি দেদার লোক তাঁর পিছনে ছুটতে লাগল, মাইল দশেক, দৌড়ে যাবার পর তিনি দেখলেন যে, রাস্তার দু'পাশের গ্রামের লোকরাও তাঁকে তাড়া করছে। শেষটা তিনি ধরা পড়েন পড়েন, এমন সময় তাঁর নজর পড়ল যে একটা বর্ম্মা-টাট্টু একটা ছোলার ক্ষেতে চরছে। তার পিছনের পা দুটো দড়ি দিয়ে ছাঁদা। নীললোহিত প্রাণপণে ছুটে গিয়ে তার পায়ের

দড়ি খুলে, তার মুখের ভিতর সেই দড়ি পুরে দিয়ে, তাতে এক পেঁচ লাগিয়ে সেটিকে লাগাম বানালেন। তারপর সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে দে ছুট্! রাত বারোটা থেকে রাত দুটো পর্য্যন্ত সে টাট্টু বিচিত্র চালে চল্‌তে লাগল, কখনো কদমে, কখনো দুল্‌কিতে, কখনো চার-পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে। জীবনে এই একটিবার তিনি ঘোড়া থেকে পড়েন নি। তার পর সে টাট্টু হঠাৎ থেমে গেল। নীললোহিত দেখলেন, সুমুখে একটা প্রকাণ্ড বিল অন্ততঃ তিন মাইল চৌড়া। অমনি ঘোড়া থেকে নেমে নীললোহিত সেই বিলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পাছে কেউ দেখতে পায়, এই ভয়ে প্রথম মাইল তিনি ডুব-সাতার কেটে পার হলেন, দ্বিতীয় মাইল এমনি সাঁতার, আর তৃতীয় মাইল চিৎ-সাঁতার দিয়ে, এই জন্য যে, পাড় থেকে কেউ দেখলে ভাববে যে,একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে। নীললোহিত যখন ওপারে গিয়ে পৌছলেন, তখন ভোর হয় হয়। ক্লান্তিতে তখন তাঁর পা আর চল্‌ছে না। সুতরাং বিলের ধারে একটি ছোট খোড়ো ঘর দেখবামাত্র তিনি 'যা থাকে কুল-কপালে' ব'লে সেই ঘরের দুয়ারে গিয়ে ধাক্কা মার্‌লেন। তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলে গেল, আর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি পরমাসুন্দরী যুবতী। তার পরণে সাদা-শাড়ী, গলায় কণ্ঠী, আর নাকে রসকলি। নীললোহিত বুঝতে পার্‌লেন যে, স্ত্রীলোকটি হচ্ছে একটি বোষ্টমী, আর সে থাকে একা। নীললোহিত সেই রমণীকে তাঁর বিপদের কথা জানালেন। শুনে তার চোখে জল এল, আর সে তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে নীললোহিতের ভালবাসায় প'ড়ে গেল। আর সেই সুন্দরীর পরামর্শে নীললোহিত পরণের ধুতি শাড়ী ক'রে পরলেন। আর সেই যুবতী নিজহাতে তাঁর গলায় কণ্ঠী পরালে, আর তার নাকে রসকলি-অঙ্কন ক'রে দিলে। গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন নীললোহিতের মুখাকৃতি ছিল একেবারে মেয়ের মত।

সুতরাং তাঁর এ ছদ্মবেশ আর কেউ ধরতে পারলে না। তার পরে তারা দু-সখীতে দুটি খঞ্জনি নিয়ে "জয় রাধে" ব'লে বেরিয়ে পড়ল। তারপর পায়ে হেঁটে ভিক্ষে করতে করতে বৃন্দাবন গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তারপর কিছুদিন মেয়ে সেজে বৃন্দাবনে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার পর, পুলিসের গোলমাল যখন থেমে গেল, তখন তিনি আবার দেশে ফিরে এলেন। আর তাঁর সেই পথে-বিবর্জ্জিতা বোষ্টমী মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বাঘনাপাড়ায় চ'লে গেল—কোনও দাড়ী-ওয়ালা বোষ্টমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করতে।

নীললোহিতের এই রোমাণ্টিক ডাকাতির গল্প মুখে মুখে এত প্রচার হয়ে পড়ল যে, শেষটা পুলিসের কানে গিয়ে পৌছল। ফলে নীললোহিত ডাকাতির চার্জ্জে গ্রেপ্তার হলেন। এ আসামীকে নিয়ে পুলিস পড়ল মহা ফাঁপরে, কারণ নীললোহিতের মুখের কথা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতির আর কোনই প্রমাণ ছিল না। পুলিস তদন্ত ক'রে দেখলে যে, যে গ্রামে নীল-লোহিত ডাকাতি করেছেন, উত্তর বঙ্গে সে নামের কোন গ্রামই নেই। যে সা-মহাজনের বাড়ীতে তিনি ডাকাতি করেছেন,- উত্তর-বঙ্গে সে নামের কোনও সা-মহাজন নেই। যে দিনে তিনি ডাকাতি করেছেন,—সে দিন বাঙলা দেশে কোথাও কোন ডাকাতি হয় নি। তারপর এও প্রমাণ হল যে, নীললোহিত জীবনে কখনো কলকাতা সহরের বাইরে যাননি, এমন কি হাবড়াতেও নয়। বিধবার একমাত্র সন্তান ব'লে নীললোহিতের মা নীললোহিতকে গঙ্গা পার হ'তে দেন নি,—পাছে ছেলে ডুবে মরে, এই ভয়ে। অপরপক্ষে নীললোহিতের বিপক্ষে অনেক সন্দেহের কারণ ছিল। প্রথমতঃ তার নাম। যার নাম এমন বেয়াড়া, তার চরিত্রও নিশ্চয় বেয়াড়া। তারপর, লোহিত রক্তের রঙ—অতএব ও-নামের লোকের খুন-জখমের প্রতি টান থাকা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, তিনি একে কুলীন

ব্রাহ্মণের সন্তান, তার উপর তাঁর ঘরে খাবার আছে; অথচ তিনি বিয়ে করেন নি, যদিচ তাঁর বয়স তেইশ হবে। তৃতীয়তঃ, তিনি বি. এ. পাশ করেছেন, অথচ কোনও কাজ করেন না। চতুর্থতঃ, তিনি রাত একটা দুটোর আগে কখনো বাড়ী ফেরেন না,—যদিচ তাঁর চরিত্রে কোনও দোষ নেই। মদ ত দূরে থাক, পুলিশ-তদন্তে জানা গেল যে, তিনি পান-তামাক পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না; আর নিজের মা-মাসী ছাড়া তিনি জীবনে আর কোনও স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়ান নি।

এ অবস্থায় তিনি নিশ্চয় interned হতেন, যদি না আমরা পাঁচ জনে গিয়ে বড় সাহেবদের ব'লে-কয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতুম। আমরা সকলে যখন একবাক্যে সাক্ষী দিলুম যে, নীললোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই, আর সেই সঙ্গে তাঁর গল্পের দু'-একটি নমুনা তাঁদের শোনালুম, তখন তাঁরা নীললোহিতকে অব্যাহতি দিলেন এই ব'লে যে,—"যাও, আর মিথ্যে কথা বলো না।" যদিচ কাইজারের সঙ্গে নীললোহিতের বন্ধুত্বের গল্প শুনে তাঁদের মনে একটু খট্‌কা লেগেছিল। এর পর থেকে নীললোহিত আর মিথ্যা গল্প করেন না ফলে গল্পও করেন না। কেন না, তাঁর জীবনে এমন কোনও সত্য ঘটনা ঘটেনি, ঐ এক গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়া—যার বিষয় কিছু বলবার আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে।

আসল কথা কি জানেন?—তিনি মিথ্যে কথা বলতেন না, কেন না ওসব কথা বলায় তাঁর কোনরূপ স্বার্থ ছিলনা। ধন-মান-পদ-পর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি বাস কর্‌তেন কল্পনার জগতে। তাই নীললোহিত যা বলতেন, সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ, সবই ছিল ঐ কল্পনার রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়। সুতরাং সেই কল্পলোক থেকে টেনে তাঁকে যখন মাটির পৃথিবীতে

নামানো হ'ল, তখন যে তাঁর প্রতিভা নষ্ট হ'ল, শুধু তাই নয়; তাঁর জীবনও মাটি হ'ল।—দিনের পর দিন তাঁর অবনতি হ'তে লাগল।

গল্প বলা বন্ধ করবার পর তিনি প্রথমে বিবাহ কর্‌লেন, তারপর চাকরী নিলেন। তারপর তার বছর বছর ছেলেমেয়ে হ'তে লাগল। তারপর তিনি বেজায় মোটা হ'য়ে পড়লেন, তাঁর সেই মুখর চোখ মাংসের মধ্যে ডুবে গেল। এখন তিনি পুরোপুরী কেরাণীর জীবন যাপন কর্‌ছেন —যেমন হাজার হাজার লোক ক'রে থাকে। লোকে বলে যে, তিনি সত্যবাদী হয়েছেন; কিন্তু আমার মতে তিনি মিথ্যার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। তাঁর স্বধর্ম্ম হারিয়ে, যেজীবন তাঁর আত্মজীবন নয়, অতএব তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা জীবন—সেই জীবনে তিনি আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা এই ভেবেই খুসি যে, তিনি এতদিনে মানুষ হয়েছেন,—কিন্তু ঘটনা কি হয়েছে জানেন? নীললোহিতের ভিতর যে মানুষ ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে—যা' টিঁকে রয়েছে তা হচ্ছে সংসারের সার ঘানি ঘোরাবার একটা রক্তমাংসের যন্ত্র মাত্র।

নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা

১

পূজোর নম্বর 'বসুমতীর' জন্য একটি গল্প লিখে দিতে, বহুদিন থেকে প্রতিশ্রুত আছি। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এতদিন লেখায় হাত দিতে পারিনি।

আজ ঘুম থেকে উঠেই সঙ্কল্প করলুম যে, যা থাকে কপালে, একটা গল্প সূর্য্য ডোব্‌বার আগেই লিখে শেষ করব।

তা'রপর কলম হাতে নিয়ে দেখি যে, আমার মাথার ভিতর এখন আর কিছুই নেই—এক কংগ্রেস ছাড়া। আর কংগ্রেসের গল্প আমি পারি শুধু পড়তে, লিখতে নয়। কেননা দিল্লীতে আমি যাইনি।

এ অবস্থায় নিজের মাথা থেকে গল্প বা'র করা অসম্ভব দেখে, একটা অপরের জানা না হোক, আমার শোনা গল্প লেখাই স্থির করলুম।

এ গল্পটি আমি নীললোহিতের মুখে শুনেছিলুম। নীললোহিত লোকটি যে কে, তা' অবশ্য আপনি জানেন। গত বৎসর এই সময়ে তাঁ'র সবিশেষ পরিচয় 'মাসিক বসুমতী'তে দিয়েছি। আর আপনার কাগজের পাঠক সম্প্রদায়েরও অনেকেরই বোধ হয়, নীললোহিতের কথা স্মরণ আছে।

আমার জনৈক ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বন্ধু একদিন আমার কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে, বর্ত্তমান "বেদ" জাল, আর এ জাল ব্রাহ্মণরা করেছে। তাঁ'র বক্তব্য ছিল এই যে, মুল বেদ যখন প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন অবশ্য তা'র বেবাক অক্ষর জলে ধুয়ে গেছল। এ অকাট্য যুক্তি শুনে আমি হাস্য সংবরণ করতে পারিনি। ফলে বন্ধুবর একেবারে

উগ্রক্ষত্রিয় হয়ে উঠে আমাকে সরোষে বলেন যে, তাঁ'র কথা আমি বুঝতে পারব না, যেহেতু, আমরা ব্রাহ্মণরা বাস করি ব্রহ্মার সৃষ্ট জগতে, আর তাঁ'রা বাস করেন বিশ্বামিত্রের জগতে। কথাটা শুনে আমি প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তা'রপর ভেবে দেখেছি যে, কথাটা সত্য। আমাদের সকলের দেহ শুধু একই মাটির পৃথিবীতে অবস্থান করে, কিন্তু প্রত্যেকের মন আলাদা আলাদা বিশ্বে বাস করে। আমি বাস করি মর্ত্ত্যলোকে, আর নীললোহিত বাস করতেন কল্পলোকে। সাদা কথায় আমি বাস করি বৃটিশ রাজ্যে, আর নীললোহিত বাস করতেন কল্পনারাজ্যে। সুতরাং আমার মুখে নীললোহিতের গল্প শুনে শ্রোতাদের দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। তখন সবে সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গেছে। কলকাতার আর কোন কথা নেই। পাঁচজন একত্র হলেই—সে কংগ্রেস কেন ভাঙ্গল, কি ক'রে ভাঙ্গল, যে জুতোটা উড়ে এসে প্রেসিডেণ্টের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, সেটা বিলেতি "পম্প্" কি পাঞ্জাবী নাগরা, মারহাট্টি চটি কি মাদ্রাজী "চাপ্লি"—এই সব নিয়ে তখন আমাদের মধ্যে ঘোর গবেষণা ও মহা বাদানুবাদ চলছে।

একদিন আমরা সকলে আড্ডায় ব'সে, উক্ত যুগপ্রবর্ত্তক জুতোটির জাতি-নির্ণয় করতে ব্যস্ত আছি, এমন সময় নীললোহিত হঠাৎ ব'লে উঠলেন যে, তিনি স্বয়ং সশরীরে সুরাটে উপস্থিত ছিলেন এবং ভিতরকার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জানে, প্রাণ গেলেও সে রহস্য সে ফাঁস করবে না। এ কথা শুনে এক জন eye-witness-এর কথা শোনবার জন্য আমরা সকলে ব্যগ্র হয়ে উঠলুম, যদিচ আমরা সবাই জানতুম যে, সে কথার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। নীল-লোহিত বললেন—"তোমরা যদি তর্ক থামাও ত গল্প বলি।" অমনি আমরা সবাই মৌনব্রত অবলম্বন করলুম। তিনি তাঁর সুরাট-অভিযানের

বর্ণনা সুরু করলেন। তাঁর কথার অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করতে হ'লে গল্প একটা নভেল হয়ে উঠবে। সুতরাং যত সংক্ষেপে পারি, তাঁ'র মোদ্দা কথা আপনাদের শোনাচ্ছি,—অর্থাৎ মাছ বাদ দিয়ে তা'র কাঁটা টুকু আপনাদের কাছে ধ'রে দিচ্ছি।

২

নীললোহিত সুরাট গেছলেন B. N. R. দিয়ে একটি প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে, অর্থাৎ একেবারে একলা; তাই তাঁর সঙ্গে অপর কোন বাঙ্গালী ডেলিগেটের সাক্ষাৎ হয়নি। গাড়ী ঢিকতে ঢিকতে ছ'দিনের দিন সন্ধ্যেবেলায় সুরাট গিয়ে পৌছল। নীললোহিত সুরাট ষ্টেশনে নেমে একখানি টঙ্গা ভাড়া ক'রে Congress-Campএর দিকে রওনা হলেন। গুজরাটে টঙ্গা অবশ্য একরকম গরুর গাড়ী, কিন্তু গুজরাটের গরু বাঙ্গলার ঘোড়ার চাইতে ঢের মজবুত ও তেজী। তা'রা ঠিক তাজি-ঘোড়ার মত কদমে চলে, আর তাদের গলার ঘণ্টা গির্জ্জার ঘণ্টার মত—সা-র-গ ম সাধে, আর বাইজীর পায়ের ঘুঙ্ঘুরের মত তালে বাজে। গাড়ীতে ছ'দিন নীললোহিতকে একরকম অনশনেই কাটাতে হয়েছিল। সকালবেলায় এক গেলাস কাঁচা দুধ ও রাত্তিরে এক মুঠো কাঁচা ছোলার বেশী তাঁ'র ভাগ্যে আর কিছু আহার জোটেনি। ষ্টেশনে ষ্টেশনে অবশ্য "লাড্ডু" পাওয়া যায়, কিন্তু সে লাড্ডু আকারে ভাঁটার মত আর সে চিজ দাঁতে ভাঙ্গবার জো নেই, গিলে খেতে হয়, আর তা' গেলবার জন্য গলার নলী হওয়া চাই ড্রেণ-পাইপের মত মোটা। আর "পুরি ?" তা'র একখানা ছুঁড়ে মারলে নাকি প্রেসিডেন্টকে আর দেশে ফিরতে হ'ত না। পৃথিবীতে নাকি এমন জুতো নেই, যার সুখতলা আকারে ও কাঠিন্যে তা'র কাছেও ঘেঁসতে পারে। এক একখানি "পুরি" যেন এক একখানা খড়ম। সুতরাং নীললোহিত যদিও অনশনে মৃতপ্রায় হয়ে ছিলেন, তবুও

সুরাটের বড় রাস্তার দৃশ্য দেখে তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা একদম ভুলে গেলেন। যতদূর যাও, পথের দু'পাশে সব জানালাতে যেন সব পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গুর্জ্জরে অবরোধপ্রথা নেই, আর গুর্জ্জররমণীদের তুল্য সুন্দরী সুরপুরীতেও মেলা ভার। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে দেখতে তাঁর মোহ উপস্থিত হ'ল, যেন প্রতি জানালায় একটি ক'রে Juliet দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি হচ্ছেন স্বয়ং Romeo; কিন্তু টঙ্গা এমনি ছুটে চলেছে যে, তিনি কারও কাছে kill the envious moon, এ কথা ক'টি বলবারও অবকাশ পেলেন না। তা'রপরে এক সময়ে তাঁর মনে হ'ল যে, টঙ্গা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, আর তাঁর দক্ষিণ ও বাম দু'পাশ দিয়েই অসংখ্য সুন্দরীর শোভাযাত্রা চলেছে। নীললোহিত যে পথিমধ্যে কারও ভালবাসায় প'ড়ে যান নি, তার একমাত্র কারণ, এই নাগরীর হাটে কাকে ছেড়ে কার ভালবাসায় তিনি পড়বেন? বিবাহ অবশ্য এক সঙ্গে দু'শ তিন'শ করা যায়, কিন্তু ভালবাসায় পড়তে হয় মাত্র এক জনের সঙ্গে— অন্ততঃ এক সময়ে ত তাই। - এদিকে পেট খালি, ওদিকে হৃদয় পূর্ণ; এই অবস্থায় নীললোহিত কংগ্রেস-ক্যাম্পে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখানে উপস্থিত হ'বামাত্র তাঁ'র রূপের নেশা ছুটে গেল। তিনি প্রথমে গিয়েই টিকিট কিনলেন, তাতেই তাঁর পকেট প্রায় খালি হয়ে এল। তা'র পর শোনেন যে, কংগ্রেস ক্যাম্পে আর জায়গা নেই; যার কাছেই যান, তিনিই বল্লেন "ন স্থানং তিলধারণে।" ছ'দিন পেটে ভাত নেই, ছ'রাত্তির চোখে ঘুম নেই, তা'র উপর আবার যদি সুরাটের পথে পথে সমস্ত রাত ঘুরে বেড়াতে হয়—তাহ'লেই ত নির্ঘাত মৃত্যু। নীললোহিত একেবারে জলে পড়লেন, আর ভেবে কোন কূলকিনারা করতে পারলেন না। তাঁর এই দুরবস্থা দেখে টঙ্গাওয়ালা দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে Extremist ক্যাম্পে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে। নীললোহিতের নাড়ীতে

আবার রক্ত ফিরে এল। টঙ্গা যে পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথ দিয়েই ফিরে চল্‌লো। এবার কিন্তু কোনও বাড়ীর কোনও গবাক্ষ আর তাঁর নয়ন আকর্ষণ করতে পার্‌লে না—যদিচ প্রতি গবাক্ষেই একটি করে' সন্ধ্যাতারা ফুটে ছিল। তিনি অকারণে সমস্ত সুরাট-সুন্দরীদের উপর মহা চ'টে গেলেন, যেন তা'রাই তাঁ'র কংগ্রেসের প্রবেশদ্বার আটকে দাঁড়িয়েছে। শেষটা রাত আটটায় তিনি কংগ্রেসের মহারাষ্ট্র-শিবিরে গিয়ে পৌঁছলেন, এবং পৌঁছেই পকেটে যে, ক'টি টাকা অবশিষ্ট ছিল, সেই ক'টি টঙ্গাওয়ালাকে দিয়ে বিদায় কর্‌লেন। মহারাষ্ট্র-শিবিরে লোকের ভিড় দেখে, সেখানে রাত কাটাতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। সে যেন একটা Black hole, এক একটা ছোট্ট ঘরে পঞ্চাশ ষাট জন ক'রে জোয়ান। "শুতে না পাই, অন্ততঃ খেতে পাব," এই আশায় তিনি সেখানে থাকাই স্থির করলেন। কিন্তু খাবার আয়োজন দেখে তাঁ'র চক্ষুস্থির! চারি-দিকে তাকিয়ে দেখেন শুধু লঙ্কা, লঙ্কা আর লঙ্কা! সে লঙ্কা কেউ কুটছে, কেউ বাঁটছে, কেউ পিষছে, কেউ ছেঁচ্‌ছে। তা'র গন্ধতেই তাঁ'র মুখ জ্বালা কর্‌তে লাগল। তিনি ঢোক গিলে মনে মনে বল্লেন, "এখন উপায় কি, নুণ দিয়েই ভাত খাব।" কিন্তু ভাত সেদিন তাঁ'র আর কপালে লেখা ছিল না। সে ক্যাম্পেও তাঁ'র স্থান হ'ল না। সকলে ধরে নিলে যে, তিনি একজন Spy। তাঁ'র যে এ-কূল ও-কূল দুকূল গেল, তা'র প্রথম কারণ তিনি অজ্ঞাতকুলশীল, আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁ'র সঙ্গে ব্যাগ-বিছানা কিছুই ছিলনা। তিনি ঘর থেকে একছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন, সুরাটের লোকের কাছে এই প্রমাণ কর্‌বার জন্য যে, তিনি হচ্ছেন একজন স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা সন্ন্যাসী।

নীললোহিত মহারাষ্ট্র-শিবির থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে। আর তাঁ'র অবস্থা তখন এই যে, পেটে ভাত

নেই, পকেটে পয়সা নেই, সুরাটে একটি পরিচিত লোক নেই। সভ্য-সমাজের মধ্যে তিনি পড়লেন দ্বিতীয় Robionson Crusoeর অবস্থায়। ঘোর বিপদের মধ্যে না পড়লে নীললোহিতের বলবুদ্ধি খুলত না। সহজ অবস্থায় নীললোহিত ছিলেন আর পাঁচজনের মত; কিন্তু বিপদে পড়লেই তিনি হয়ে উঠতেন একটি Superman, সংস্কৃতে যাকে বলে অতিমানুষ। তাই পথে বেরিয়েই তাঁর শরীর-মনে কে জানে কোথেকে অলৌকিক শক্তি ও সাহস এসে জুটল। তিনি তাঁর মনকে বোঝালেন যে, তিনি hunger-strike করেছেন—সভ্যসমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে। অমনি তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় উড়ে গেল। তিনি সঙ্কল্প কর্‌লেন যে, এ বিপদ থেকে তিনি আত্মবলে উদ্ধার লাভ করবেন। কি ক'রে যে তা কর্‌বেন, সে বিষয়ে অবশ্য তাঁ'র মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু তাঁ'র ছিল আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে সকল কংগ্রেসওয়ালার উপর তাঁ'র সমান অভক্তি জন্মাল; কারণ, তা'রা যা করতে যায়, তা' দল বেঁধে ও পরস্পরের হাত ধরাধরি ক'রে। একলা কিছু করবার সাহস ও শক্তি তাদের কারও শরীরে নেই। নীললোহিত তাই "একলা চলরে" ব'লে সেই অমানিশার অন্ধকারের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবার তিনি রাজপথ ছেড়ে সুরাটের গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়লেন। সে সব গলিতে যেন অন্ধকারের বান ডেকেছে। রাস্তার দু'পাশের বাড়ীগুলোর দুয়োর, জানালা সব জেলের ফটকের মত কষে বন্ধ। চারপাশে সব নির্জ্জন, সব নীরব, নিঝুম। যেন সমগ্র সুরাট সহরটা রাত্তিরে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দু'একটা বাড়ীর গবাক্ষ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যেখানেই আলো, সেইখানেই কান্নার সুর। সুরাটে তখন খুব প্লেগ হচ্ছিল। নীললোহিত ছাড়া অপর কেউ এই শ্মশানপুরীর মধ্যে ঢুকলে ভয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ত।

কিন্তু তিনি ঘণ্টা দুই এই অন্ধকারের ভিতর সাঁতরাতে সাঁতরাতে শেষটা কূলে গিয়ে ঠেকলেন। হঠাৎ তিনি একটা বাড়ীর সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন, যা'র দোতলার ঘরে দেদার ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে, আর যা'র ভিতর দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে স্ত্রীকণ্ঠের অতি সুমধুর সঙ্গীত। নীললোহিত তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে নিজের মাথার পাগড়ীটি খুলে সেই বাড়ীর বারান্দার কাঠের রেলিংয়ে লাগিয়ে দিয়ে, সেই পাগড়ী বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। তাঁ'র পায়ের শব্দ শুনে ঘর থেকে একটি অপ্সরোপম রমণী বেরিয়ে এলেন। তা'রপর দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে রইলেন। এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক নীললোহিত জীবনে কিম্বা কল্পনাতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখেন নি। নীললোহিতের মনে হ'ল যে, রমণীটি সুরাটের সকল সুন্দরীর সংক্ষিপ্তসার। তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গ একেবারে হীরেমাণিকে ঝক্ ঝক্ করছিল। নীললোহিতের চোখ সে রূপের তেজে ঝলসে যাবার উপক্রম হ'ল, তিনি মাটির দিকে চোখ নামালেন। প্রথম কথা কইলেন স্ত্রীলোকটি। তিনি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

নীললোহিত উত্তর করলেন, "বাঙ্গালী।"

"সুরাটে কেন এসেছ?"

"কংগ্রেস ডেলিগেট্ হয়ে।"

"কংগ্রেসক্যাম্পে না গিয়ে এখানে কেন এলে?"

"পথ ভুলে।"

"টঙ্গায় চড়লে টঙ্গাওয়ালা ত তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেত।"

"আমার ব্যাগ, বিছানা সব ষ্টেশনে হারিয়ে গিয়েছে। টাকাকড়ি সব ব্যাগের ভিতরে ছিল। তাই টঙ্গা ভাড়া করবার পয়সা কাছে না থাকায় হেঁটে বেরিয়েছিলুম। তা'রপর তিন চার ঘণ্টা ঘোরবার পর এখানে এসে পৌঁছেছি।"

"এ বাড়ীতে ঢুকলে কিসের জন্য ?"

"আলো দেখে ও সঙ্গীত শুনে।"

"পরের বাড়ীতে না বলা-কওয়া প্রবেশ করতে তোমার দ্বিধা হল না ?"

"যে জলে ডোবে, সে বাঁচবার জন্য হাতের গোড়ায় যা পায়, তাই চেপে ধরে। আমি উপবাসে মৃতপ্রায়। কিছু খেতে পাই কি না দেখবার জন্য এখানে প্রবেশ করেছি—বাড়ী কার, তা ভাববার আমার সময় ছিল না। ঝাড়-লণ্ঠন দেখে বুঝ্‌লুম— এ বাড়ীতে অন্নকষ্ট নেই, আর গান শুনে বুঝলুম, এ বাড়ীতে প্লেগ নেই।"

নীললোহিতের কথা শুনে স্ত্রীলোকটির মনে করুণার উদয় হল। তিনি তাঁকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। আর দাসীদের ডেকে বল্লেন, নীললোহিতের জন্য খাবার আনতে। তাই শুনে নীললোহিতের ধড়ে আবার প্রাণ এল। তিনি এক নজরে ঘরটি দেখে নিলেন। নীচে কাশ্মীরী গালিচা পাতা, আর ঘর-পোরা বাদ্যযন্ত্র। তিনি গৃহকর্ত্রীকে তাঁ'র পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে উত্তর দিলেন,—

"তোমরা যা হ'তে চাচ্ছ, আমি তাই।"

"অর্থাৎ ?"

"আমি স্বাধীন।"

এর পর বড় বড় রূপোর থালায় ক'রে দাসীরা দেদার ফল-মিষ্টি নিয়ে এসে হাজির করলে। নীললোহিত আহারে ব'সে গেলেন। সে আহারের বর্ণনা করতে হ'লে দু'খানি বড় বড় ক্যাট্‌লগ তৈরী করতে হয়। একখানি ফলের আর একখানি মিষ্টান্নের। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সকল ঋতুর ফল আর সকল প্রদেশের মিষ্টান্ন নীললোহিতের সুমুখে স্তূপীকৃত ক'রে রাখা হ'ল। তিনিও তাঁ'র এক সপ্তাহের ক্ষুধা মেটাতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি সেদিন আহারে স্বয়ং কুম্ভকর্ণকেও হারিয়ে দিতে

পার্‌তেন। তাঁ'র আহার প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এমন সময়ে ফটকে কে অতি আস্তে ঘা দিলে। গৃহকর্ত্রী একটি দাসীকে নীচে গিয়ে দুয়োর খুলে দিতে আদেশ কর্‌লেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি ভদ্রলোক এসে সেখানে উপস্থিত। নীললোহিত দেখেই বুঝ্‌তে পারলেন যে, তিনি বম্বে অঞ্চলের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তিনি যে অগাধ ধনী, তা তাঁ'র উদরেই প্রকাশ। ভদ্রলোক নীললোহিতকে দেখেই আঁত্‌কে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর অনেকক্ষণ ধ'রে গুজরাটিতে কি কথাবার্ত্তা হ'ল। তা'রপর সেই ভদ্রলোকটি নীল-লোহিতকে সম্বোধন ক'রে অতি অভদ্র হিন্দীতে বল্‌লেন যে, আহারান্তে তাঁকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নচেৎ তিনি তাঁকে পুলিসের হাতে সঁপে দেবেন। এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি বল্‌লেন যে, তা কখনই হ'তে পারে না। সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরে বেড়ালে বাঙ্গালী ছোক্‌রাটি প্লেগে মারা যাবে। আর ছোক্‌রাটি যে চোর-ডাকাত নয়, তার প্রমাণ তার চেহারা—"এইসা খোপ্‌সুরত" ছোক্‌রা চোর-ডাকাত কখনই হ'তে পারে না। এ কথা শুনে ভদ্রলোকটি ভ্রূ কুঞ্চিত কর্‌লেন। আবার দু'জনে বাগ্‌বিতণ্ডা সুরু হ'ল। শেষটা উভয়ের মধ্যে এই আপোষ হ'ল যে, রাত্তিরে নীললোহিতকে চাকরদের সঙ্গে থাক্‌তে হবে, কিন্তু সকালে উঠেই তাঁকে এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে। ঘুমে নীললোহিতের চোখ বুজে আসছিল, তাই তিনি দ্বিরুক্তি না ক'রে নীচে গিয়ে চাকরদের ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি মনে মনে সঙ্কল্প কর্‌লেন যে, ঐ বোম্বেটের অপ-মানের প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি দেশে ফির্‌বেন না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে নীললোহিত চোখ তাকিয়ে দেখেন যে, বেলা দশটা বেজে গিয়েছে। তিনি মুখ-হাত ধুয়ে, সবে গালে হাত দিয়ে বসেছেন, এমন সময় উপর থেকে হুকুম এল যে,—"বাইজী

বোলাতা।" উপরে গিয়ে দেখেন যে স্ত্রীলোকটি নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। সাজসজ্জা সব বাঙ্গালী রমণীর ন্যায়। শরীরে জহরতের সম্পর্ক নেই, গহনা আগাগোড়া সোনার, আর তার পরণে ঢাকাই শাড়ী, গায়ে একখানি বুটিদার ঢাকাই চাদর। তিনি নীললোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে, তিনি এখন কোথায় যেতে চান? নীললোহিত উত্তর করলেন, কংগ্রেসক্যাম্পে। স্ত্রীলোকটি বললেন, সে হতেই পারে না। গত রাত্তিরের আগন্তুক ভদ্রলোকটি যদি তাঁর সাক্ষাৎ পান, তাহ'লে তাঁর বিপদ ঘটবে,—হয় গুণ্ডা, নয় পাহারাওয়ালার হাতে তাঁকে বিড়ম্বিত হ'তে হবে। অতএব পত্রপাঠ দেশে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকটি তাঁর জন্য ব্যাগ বিছানা, দেশে ফেরবার রেল-ভাড়ার টাকা ইত্যাদি সব ঠিক রেখেছেন।

কিন্তু কংগ্রেস যাওয়ায় বিপদ আছে, এ কথা শুনে নীললোহিত জেদ ধ'রে বসলেন যে, তিনি কংগ্রেসে যাবেনই যাবেন। সেই সুন্দরী তাঁকে অনেক কাকুতি-মিনতি করলে; কিন্তু নীললোহিত কিছুতেই তাঁর গোঁ ছাড়লেন না! "ভয় পেয়েছি," এ কথা স্ত্রীলোকের কাছে স্বীকার, পুরুষ-মানুষে সহজে করে না। আর উক্ত স্ত্রীলোকটি ছিলেন যেমন সুন্দরী, নীল-লোহিতও ছিলেন তেমনি বীরপুরুষ। অনেক বকাবকির পর শেষটা স্থির হ'ল যে,—উক্ত স্ত্রীলোকটি স্বয়ং নীললোহিতকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসে যাবেন—নিজের দাসী সাজিয়ে। তিনি বললেন যে, তিনি সঙ্গে থাকলে কেউ নীললোহিতের কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর নীললোহিতকে পাঞ্জাবী রমণীর বেশ ধারণ করতে হ'ল। পরণে চুড়িদার পাজামা, পায়ে নাগরা, গায়ে কুর্ত্তা ও মাথা-মুখ-ঢাকা ওড়না। এ সব সাজসজ্জা গৃহকর্ত্রীর একটি পাঞ্জাবী দাসীর কাছ থেকেই পাওয়া গেল। আর সে সব কাপড় নীললোহিতের গায়ে ঠিক ব'সে গেল।

কেননা পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক ও বাঙ্গালী পুরুষ মাপে প্রায় এক। তা'রপর দু'জনে একটি আধ-বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে কংগ্রেসে গিয়ে মেয়েদের গ্যালারিতে বস্‌লেন। কংগ্রেসের কাজ সুরু হ'ল, এমন সময় হঠাৎ নীল-লোহিত দেখতে পেলেন যে, উক্ত ভদ্রলোক কংগ্রেসের হোমরা-চোমরাদের মধ্যে ব'সে আছেন। এ দেখে তিনি আর তাঁর রাগ সাম্‌লাতে পার্‌লেন না, ডান পায়ের নাগরা খুলে তাঁকে ছুঁড়ে মার্‌লেন। সেই নাগরাটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রেসিডেন্টের পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। নীললোহিতের কাণ্ড দেখে স্ত্রীলোকটি মুহূর্ত্তের জন্য হতবম্ভ হয়ে রইলেন। তা'র পরেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে নীললোহিতের হাত ধরে' তিনি কংগ্রেসের তাঁবুর বাইরে এসে গাড়ীতে চ'ড়ে বাড়ী ফিরলেন। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার নীললোহিতকে বাঙ্গালী সাজিয়ে ব্যাগ-বিছানা সমেত সেই গাড়ীতেই তাঁকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। ষ্টেশনে নীললোহিত ব্যাগ খুলে দেখেন তা'র ভিতর পাঁচশ টাকার নোট আর সেই স্ত্রীলোকটির একখানি ছবি রয়েছে। সেই টাকা দিয়ে টিকিট কিনে তিনি দেশে ফিরলেন। সুরাট-কংগ্রেসের যুগপ্রবর্ত্তক জুতো যে নীললোহিতের পাদুকা, এ কথা শুনে আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

নীললোহিতের মুখে এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনে আমরা সকলে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম—কেন না তার এ গল্প সম্বন্ধে কি বলব কেউ তা' ঠাওরাতে পারলুম না। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর রামযাদব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি সেই সুরাট-সুন্দরীর পাঁচ শত টাকা বেমালুম হজম ক'রে ফেললেন? নীললোহিত উত্তর করলেন—"না। আমি কাশীতে গিয়ে সেই পাঁচশ' টাকা দিয়ে অন্নপূর্ণার পূজা দিয়ে এসেছি।" আবার সকলে চুপ করলেন। তা'রপর মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, "সে ছবিখানা তোমার কাছে আছে?" নীললোহিত

উত্তর করলেন—"হাঁ, আছে।" দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল—"সেখানি দেখাতে পার?" উত্তর—"দেখতে ইচ্ছে হয়, কিনে দেখতে পারো।" প্রশ্ন—"সে ছবি বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায়?" উত্তর—"দেদার।" প্রশ্ন—"কি রকম?" উত্তর—"নুরজাহানের ছবি দেখলেই সেই সুরাট-সুন্দরীকে দেখতে পাবে। এ দুটি স্ত্রীলোকই এক ছাঁচে ঢালাই।"

এর পর কিছু বলা বৃথা দেখে আমরা সভা ভঙ্গ ক'রে চ'লে গেলুম।

নীললোহিতের স্বয়ম্বর

আদিপর্ব্ব

সেদিন রূপেন্দ্র আমাদের নবতর-জীবন সমিতিতে মহাবক্তৃতা করছিলেন, এই কথা সকলকে বোঝাবার জন্য যে, আমাদের দেশের মামুলি বিবাহপ্রথার বদলে স্বয়ম্বর-প্রথা না চালালে আমরা জাতি-গঠন কিছুতেই করতে পারব না।

রূপেন্দ্রের এ বিষয়ে এত উৎসাহ হবার কারণ—প্রথমতঃ তাঁর বাপ মা তাঁর জন্য মেয়ে খুঁজছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি দু'দিন আগে রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গ পড়েছিলেন, আর তৃতীয়তঃ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যথার্থই রূপেন্দ্র, অর্থাৎ অসাধারণ সুপুরুষ। আর আমরা যে ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁর বক্তৃতা একমনে শুনছিলুম, তার কারণ আমরা সকলেই ছিলুম অবিবাহিত অথচ বিবাহযোগ্য। কাজেই এ আলোচনায় আমরা সকলেই মনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম, চুপ করে ছিলেন সুধু নীললোহিত। তাই রসিকলাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, তুমি কোন কথা কইছ না কেন? রূপেন্দ্রের প্রস্তাবে তোমার মৌনতা কি সম্মতির লক্ষণ নাকি?" নীললোহিত কিঞ্চিৎ বিরক্তির স্বরে বল্লেন, "যা হয় তা হওয়া উচিত, এরকম nonsensical কথার উপর আর কি বলব?" এ কথা শুনে আমরা সকলেই কান খাড়া করলুম, কেননা বুঝলুম এইবার নীললোহিতের কেচ্ছা সুরু হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"বাঙলার মেয়েরা আজও স্বয়ম্বরা হয় নাকি?" নীললোহিত বললেন, "আলবৎ।" আমি অবার

প্রশ্ন করলুম, "তুমি কি করে জানলে?" নীললোহিত বললেন, "জানলুম কি করে? বই কি কাগজ পড়ে নয়, শুঁড়ির দোকান কিম্বা গুলির আড্ডায় পরের মুখে শুনেও নয়—নিজের চোখে দেখে?"

—চোখে দেখে?

—হাঁ, চোখে দেখে। আমি একটি জাঁকালো স্বয়ম্বর-সভায় সশরীরে উপস্থিত ছিলুম, আর আমার চোখ বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা ত তোমরা সকলেই জানো।"

ব্যাপারটা কি হয়েছিল শোনবার জন্য আমরা বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করাতে, নীললোহিত তাঁর বর্ণনা সুরু করলেন :—

আমি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একখানি চিঠি পাই, অক্ষরের ছাঁদ দেখে মনে হল মেয়ের লেখা। তার প্রতি অক্ষরটি যেন ছাপার অক্ষর, আর সেগুলি সাজানো হয়েছে সব সরল রেখায়। লেখা দেখে মনে হল পূর্ব্বপরিচিত, কিন্তু কোথায় এ-লেখা দেখেছি, তা' মনে করতে পারলুম না। শেষটা চিঠিখানি খুলে যা পড়লুম, তাতে অবাক হয়ে গেলুম। চিঠিখানি এই :—

"আপনি জানেন যে বাবা হচ্ছেন সেই জাতীয় লোক, আপনারা যাকে বলেন idealist। একটা idea তাঁর মাথায় ঢুকলে, সেটিকে কার্য্যে পরিণত না করে তিনি থামেন না। আর অপর কেউ তাঁকে থামাতে পারে না, কারণ তাঁর পয়সা আছে, আর সে পয়সা তিনি অকাতরে অপব্যয় করেন। বড়মানুষের খোশ-খেয়ালও ত একরকম idealism।

"বাবা যেদিন থেকে পৈতে নিয়ে ক্ষত্রিয় হয়েছেন, সেদিন থেকেই তিনি যথাসাধ্য শাস্ত্রানুমোদিত ক্ষাত্রধর্ম্মের চর্চ্চা করছেন। অতঃপর তিনি মনস্থির করেছেন যে, আমাকে এবার স্বয়ম্বরা হতে হবে। আমাদের বাড়ীতে আগামী মাঘী পূর্ণিমায় স্বয়ম্বর সভা বসবে। আপনি যদি সে

সভায় উপস্থিত হন, অবশ্য নিমন্ত্রিত হিসেবে নয়, দর্শক হিসেবে—ত খুশী হই। এরকম অপূর্ব্ব নাটক আপনি কলকাতায় কোন থিয়েটারেও দেখ্‌তে পাবেন না। অবশ্য আপনাকে ছদ্মবেশে আস্‌তে হবে। কি করে কি করতে হবে সে সব মেজদা' আপনাকে জানাবেন। ইতি—

মালা।"

চিঠি পড়েই বুঝলুম যে এ মালশ্রীর চিঠি।

আমাদের ভিতর কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মহিলাটি কে, মাদ্রাজী না মারাঠী?" নীললোহিত উত্তর করলেন, "চিঠি শুনে কি মনে হল যে, ও চিঠি কোনও কাছা-কোঁচা-দেওয়া মেয়ের হাত থেকে বেরতে পারে? দু'পাতা ইংরেজী পড়ে মাতৃভাষাও ভুলে গিয়েছ নাকি?

— না, তা' ভুলিনি। কিন্তু কোনও বাঙালী মেয়ের মালশ্রী নাম কখনও শুনিনি। এমন কি হাল-ফেশানের নভেল-নাটকেও পড়িনি।

—সে নিজের নাম নিজে রাখেনি, রেখেছে তার বাপ মা।

—মেয়েটি কার মেয়ে?

—রাজা ঋষভরঞ্জন রায়ের একমাত্র সন্তান।

বাপের নাম শুনে আমরা অনেকেই আর হাসি রাখ্‌তে পারলুম না। আমাদের হাসি দেখে ও শুনে নীললোহিত মহা চটে বললেন—"বীরবলী ভাষা পড়ে পড়ে যদি সাধুভাষা ভুলে না যেতে, তাহলে আর অমন করে হাসতে না। এ ঋষভ সঙ্গীতের ঋষভ, বাঙলায় যাকে বলে রেখাব। সুরনগরের রাজ-পরিবারের ছেলেমেয়েদের নামকরণ করা হয় সঙ্গীতাচার্য্যদের উপদেশমত। মালশ্রীর পিসিদের নাম হচ্ছে জয়জয়ন্তী ও পটমঞ্জরী, আর তার পিসতুতো মেজদাদার নাম হচ্ছে নটনারায়ণ, আর বড় দাদার নাম ছিল দীপক। গান বাজনার যদি ক, খ, জানতে, তাহলে এগুলি যে সব বড় বড় রাগরাগিণীর নাম, তা আর আমাকে তোমাদের

বলে দিতে হত না। বনেদি পরিবারের ছেলের নাম কি হবে পাঁচু, আর মেয়ের নাম পাঁচী ?"

নীললোহিতের এ বক্তৃতা শুনে রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে এ পরিবারে সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চ্চা আছে ?" নীললোহিত বললেন—"রাজা ঋষভরঞ্জন পয়লা নম্বরের ধ্রুপদী। তাঁর তুল্য বাজখাঁই গলা কোনও গাঁজাখোর ওস্তাদেরও নেই"। রসিকলাল উত্তর করলেন—"আমরা গান বাজনার ক, খ, না জানি—এটা জানি যে ঋষভের গলা বাজখাঁইই হয়ে থাকে।" এ কথা শুনে আমরা কোনমত প্রকারে হাসি চেপে রাখলুম, এই ভয়ে যে নীললোহিত আমাদের হাসি দ্বিতীয়বার আর সহ্য করতে পারবেন না। নীললোহিত বললেন -"কথায় কথায় যদি বস্তাপচা রসিকতা করো, তাহলে আমি আর কথা কইব না।"

অনেক সাধ্য-সাধনার পর নীললোহিত মালশ্রীর স্বয়ম্বরের গল্প বলতে রাজী হলেন, on condition আমরা কেউ টুঁ শব্দ করব না। নীললোহিত আরম্ভ করলেন,—তোমাদের দেখছি আসল ঘটনার চাইতে তার সব উপসর্গ সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশী। এ হচ্ছে বিলেতী নভেল পড়ার ফল। গল্প যাক্ চুলোয়, তার আশ-পাশের বর্ণনাই হল মূল। ছবি বাদ দিয়ে তার ফ্রেমের রূপই তোমরা দেখতে চাও। সে যাই হোক্, এখন আমার গল্প শোনো।

মালশ্রীর মেজদাদা অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের ভাগ্নে আমার একজন বাল্যবন্ধু। রূপেন্দ্রের বিশ্বাস তিনি বড় সুপুরুষ। একবার নটনারায়ণকে গিয়ে দেখে আসুন চেহারা কাকে বলে ;—তার উপর সে আশ্চর্য্য গুণী। নাচে গানে তার তুল্য গুণী, amateur-দের ভিতর আর দ্বিতীয় নেই। আর তার কথাবার্ত্তা শুনলে রসিকলাল বুঝতেন যথার্থ সুরসিক কাকে বলে।

রাজাবাহাদুর যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন নটনারায়ণের সুপারিসে আমি মালশ্রীর প্রাইভেট টিউটার হই। ইংরেজী সে আমার কাছেই শিখেছে। তেরো থেকে ষোলো, এই তিন বৎসর সে আমার কাছে পড়ে যেরকম ইংরেজী শিখেছে, সে ইংরেজী তোমরা কেউই জানোনা। আর তাকে এত যত্ন করে পড়িয়েছিলুম কেন জানো? মেয়েটি সত্যিই ডানাকাটা পরী, তার উপর আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী। তারপর রাজাবাহাদুর আজ দু-বৎসর হল দেশে চলে গিয়েছেন,—আমলাদের অত্যাচারে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল বলে। ইতিমধ্যে তাঁদের আর কোন খবরই পাইনি, হঠাৎ ঐ চিঠি এসে উপস্থিত। সকালে চিঠি পেলুম, বিকেলেই মেজদা'র সঙ্গে দেখা করলুম। মালশ্রী নটনারায়ণকেও চিঠি লিখেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম—

—মেজদা, ব্যাপার কি?

—রাজামামার খেয়াল।

—এ খেয়ালের ফল দাঁড়াবে কি?

—প্রকাণ্ড তামাসা।

—সে তামাসা আমিও দেখ্‌তে চাই।

—সেখানে গেলেই দেখ্‌তে পাবে।

—সেখানে যাই কি করে?

—নামরূপ ভাঁড়িয়ে।

—কি সেজে?

—বর সেজে নয়।

তারপর সে পরামর্শ দিলে যে, আমি দরওয়ান সেজে ও-সভায় যেতে পারি। রাজাবাহাদুরের পুরোনো জমাদার রামটহল সিং জনকতক নতুন

ভোজপুরি দরওয়ান সংগ্রহ করবার জন্য কলকাতায় এসেছে; তাদের দলেই আমি ঢুকে যেতে পারি।

উদ্যোগপর্ব্ব

তারপর দিন সকালে আমি মেজদা'র ওখানে হাজির হলুম। আমার নাম হল নীললাল সিং, আর নটনারায়ণ আমাকে এ দলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলে। সবরকম ভোজপুরি দেহাতী বুলি আমি বাঙলার চাইতেও অনর্গল বলতে পারি। আর "করলবড়া"র জায়গায় ভুলেও আমার মুখ থেকে "করলবাণী" বেরোয় না; কাজেই রামদুলাল সিং, রাম অবতার সিং; রামখেলাওয়ন সিং, রামদিন সিং, রামযশ সিং, রামরূপ সিং, রামভূপ সিং, রামদৎ সিং, রামগোলাম সিং, রামগোপাল সিং প্রভৃতি ভোজপুরি ছত্রীর দল আমাকে আর বাঙালা বলে চিন্‌তে পারলে না। আমি জমাদার হয়েই দু-বেটা মূর্ত্তিমান পাপকে সুধু বিদেয় করলুম। কারণ ওঙ্কারনাথ ব্রাহ্মণ ও বৈজনাথ ব্রাহ্মণকে দেখেই বুঝলুম যে দু-বেটাই মৃজাপুরি গুণ্ডা, দু-বেটাই খুনে। দু-পয়সার লোভে কাকে কখন চোরা-ছোরা মেরে দেবে, তার ঠিক নেই। আর ফলে আমার বদনাম হবে।

এই রামসিংদের সঙ্গে আমার দু'দণ্ডেই ভাব হয়ে গেল, আর তাদের এমন প্রিয়পাত্র হয়ে পড়্‌লুম যে, সেই রাত্তিরে ট্রেণে রামগোলাম সিং ও রামগোপাল সিং তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলে। আমি দু'জনকেই কথা দিলুম যে, প্রথমে মুনিবের মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক্—তারপর আমার বিয়ের কথা ঠিক করা যাবে। তারা বললে—"হ বাৎ ঠিক হায়"। Loyalty কাকে বলে দেখ্‌তে চাও ত এদের দেখো। সেই একদিনের আলাপ, কিন্তু আজও যদি খবর দিই ত তারা

সুতোপটী, ময়দাপটী, পাথুরেঘাটা, দরমাহাটা, যে যেখানে আছে সে সেখান থেকে হাতের গোড়ায় যে হাতিয়ার পায়, তাই নিয়ে ছুটে আসবে। আজও বড়বাজারের গদিতে গদিতে ও পাথুরেঘাটার দেউড়িতে দেউড়িতে একথা প্রচার যে, বাঙলামে কোই মরদ হ্যায় ত হ্যায় নীললাল ব্রাহ্মণ। আমি যে ছত্রী নই, সে-কথা তারা পরে জানতে পেরেছে, আর তারপর থেকেই আমার সঙ্গে দেখা হলেই তারা বলে, "গোড় লাগি মহারাজ"।

আমি সদলবল বিকেলে ট্রেণে উঠলুম থার্ড ক্লাসে, আর ফাষ্ট ক্লাসে উঠলেন আর একদল, কে তা চিনিনে। ভোর হতে না হতেই পীরপুর ষ্টেশনে পৌছলুম। রাত্তিরে অবশ্য গাড়ীতে ঘুম হয়নি। আমাদের মুখে যেমন সিগারেট, রামসিংদের মুখে তেমনি গাঁজার কল্‌কে, মধ্যেমধ্যেই ধোঁয়া ছাড়ছে। তার উপর আবার গান। কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভজন, কেউ মোবারকবাদী, কেউ বা আবার লাউনি। ভজনই এরা গায় ভাল, কারণ ভজনে তান নেই, আছে শুধু টান। তাদের মুখে ভজন-গুলোই আমার লাগছিল ভাল। "প্রভু অগুণে চিতে না ধরো" ভজনটা শুনে আমার মন ভক্তিরসে তেমন স্যাঁৎসেঁতে হয়ে ওঠেনি, যেমন হয়েছিল "সাহেব আল্লা করিম রহিম" এই ইস্‌লামী ভজন শুনে। হিন্দু-মুসলমানের মনের গর্ভ-মন্দিরে যে একই দেবতা বিরাজ করছেন, এই সব গানের প্রসাদে সে-সত্য আমরা আবিষ্কার করি। মোবারকবাদী কাকে বলে জানো?—শুভকর্ম্মের শুভলগ্নে গান। ভক্তিরস অবশ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাই ওদের মধ্যে সব চেয়ে ফুর্ত্তিওয়ালা ছোকরা রামরঙ্গিলা সিং যখন এই বিয়ের গান ধরলে—

"হাস হাসকে ঘুঁঘট খোলে লালবনা।
আম্মা মেরে টীকা দেখলে ভয়া লালবনা॥

তখন ঘরসুদ্ধ হাসির গর্‌রা পড়ে গেল। "বর আমার ঘোমটা খুলে কপালে রুলির ফোঁটা দেখে নিয়েছে"—এ কথায় হাসবার যে কি আছে তা জানিনে, কিন্তু ঐ সূত্রে যে-সব দেহাতি রসিকতা শুনলুম, তা তোমাদের না শোনাই ভাল। সে যাই হোক, ঘুম না হলেও রাতটা কেটেছিল ভাল। ব্যাপার হয়েছিল একদম Musical Soiree।

এতক্ষণ সকলে চুপ করে ছিল। অবশেষে আমাদের মধ্যে প্রধান গাইয়ে, বিশ্বনাথ ওস্তাদের সাঁগ্‌রিদ শ্রীকণ্ঠ বলে উঠলেন—"নীললোহিত, তুমি দেখছি গানবাজনাতেও expert হয়ে উঠেছ। ভজনের সঙ্গে খেয়ালের তফাৎ কি, তাও তুমি জানো।"

তিনি উত্তর করলেন—তিন বৎসর ত আর কানে তুলো দিয়ে মালাকে পড়াইনি। ও-বাড়ীতে যে দিবারাত্র ওস্তাদী গান হয়। গানের expert গলা সাধলে হয় না, তার জন্য চাই কান সাধা।

—মানলুম তাই। আর দরওয়ানরাও সব ওস্তাদি গান গায়? অবাক্ করলে।

—ভাল! দরওয়ানের সঙ্গে ওস্তাদের তফাৎটা কি? দু'জনেই ডালরুটি ও গাঁজা খায়, দু'জনেই মুগুর ও সুর ভাঁজে। কেন, তুমি কখনও কোন পালোয়ানকে মৃদঙ্গের সঙ্গে তাল ঠুকে কুস্তি করতে দেখো নি? ওরা সব আজ ওস্তাদ কাল দরওয়ান, আজ দরওয়ান কাল ওস্তাদ,—যখন যার যেমন পরবস্তি হয়।

তারপর তিনি আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—যা' বল্লুম তার থেকে মনে ভেবো না যে, ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনরূপ prejudice আছে, কি ছিল। নিরক্ষর ও নিঃস্ব হলেও, মানুষের অন্তরে যে প্রেম ও ভক্তি আর দেহে জোর ও হিম্মত থাকতে পারে, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক্‌লে তোমরাও তা' দেখতে পেতে। তোমরা ত 'হিষ্টরি'

পড়েছ। সন সাঁতাওনকে গদড় কারা করেছিল? তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা, না এদের বাপ-ঠাকুরদারা? তোমরা এদের ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা করো, তার কারণ তোমরা জানো না ছাতুর ভিতর কি মাল আছে। কালিদাস কি খেয়ে মেঘদূত লিখেছিলেন, ভাত না ছাতু?

আমি বললুম—হয়েছে, এখন গল্প বলো।

নীললোহিত উত্তর করলেন—আমি ত তাই বলতে চাই, কিন্তু তোমরা বলতে দেও কৈ? গল্প শুনতে তোমরা শেখোনি, শিখবেও না, কারণ তোমরা চাও নিজের নিজের বিদ্যে দেখাতে,—কেউ সঙ্গীতের, কেউ সাহিত্যের। এত সমালোচকের পাল্লায় পড়লে আমি ত আমি, Shakespeare-ও তাঁর গল্প বল্‌তে পারতেন না। কেউ না কেউ Caliban-এর anthropology নিয়ে ঘোর তর্ক সুরু করত। যদি সত্যিই শুনতে চাও ত এখন শোনো;—বিদ্যে গোলদীঘিতে গিয়ে জাহির করো।

পীরপুর ষ্টেশন থেকে নুরনগর দশ মাইল রাস্তা। আমি গাড়ী থেকে নেমেই, আমাদের দলবলকে একবার drill করালুম, এবং তারপর সকলকে shoulder arms করে quick march করতে হুকুম দিলুম। আর একখানি লরিতে ভাবী জামাইবাবুরা রওনা হলেন; অর্থাৎ তাঁরা, যাঁরা ট্রেণে ফার্ষ্ট ক্লাসে এসেছিলেন। হাজার হাজার নাকে বেসরপরা চাষার মেয়ে দু-পাশে কাতার দিয়ে আমাদের শোভাযাত্রা দেখতে লাগল। তারা বলাবলি করতে আরম্ভ করলে—"এ কিরকম হল, বরের দল চলেছে হেঁটে—আর তাদের তল্পীদাররা চেপেছে মোটর গাড়ীতে,—বোধহয় মালপত্র হেপাজৎ করে নিয়ে যাবার জন্যে?" এ ভুল যে তাদের হয়েছিল, তার কারণ আমার দলবলরাই ছিল দেখতে রাজপুত্তুরের মত, —আর যারা লরিতে ছিল তারা দেখতে তোমরা যেমন।

আমরা দু'দলই রাজবাড়ীতে একসঙ্গে পৌছলুম। পাড়াগেঁয়ে কাঁচা রাস্তা, সে রাস্তায় আমাদের পায়ের সঙ্গে মোটর পাল্লা দিতে পারবে কেন? সেখানে গিয়েই জামাইবাবুরা রাজাবাহাদুরের Guest-houseএ চলে গেলেন, আর আমাদের বাসা হল দেউড়ির ডান পাশের ভোজপুরি ব্যারাকে।

বাঁ পাশের ঘরগুলোতে আস্তানা করেছিল—বাঙালী লাঠিয়ালরা। গিয়ে দেখি তারা সব সিঙ্গার-পটার করছে। কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁতন করছে, কেউ বাবরি চুল আঁচড়াচ্ছে ত আঁচড়াচ্ছেই, কেউ আবার একমনে দাঁতে মিশি দিচ্ছে। সকলেরই পরনে মিহি শান্তিপুরে ধুতি, কোমরে গোট, বাজুতে দাওয়া আর দোয়া-ভরা কবচ ও মাদুলি, আর কাঁধে লাল ডুরেদার গামছা। বেটারা যেন সব নবাবপুত্তুর—কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। এরা পৃথিবীতে এসেছে যেন পান দোখতা খেতে আর কাজিয়ার সময় লোকের পেটে সড়কি বসিয়ে দিতে। তার পরেই নিরুদ্দেশ। বেটাদের বাড়ী হচ্ছে হয় নটীবাড়ী নয় শ্রীঘর—আর যেখানেই তারা যায়, সেখানেই ত এ দুই ঘরবাড়ী আছে। এই সব লাল-খাঁ কালো-খাঁদের বাঁয়ে রেখে, আমরা নিজের আড্ডায় গিয়ে ঢুকলুম।

দিনটে কেটে গেল হাতিয়ার শানাতে। কারণ, রাজবাড়ী থেকে যে সব ঢাল-তলওয়ার আমাদের দেওয়া হয়েছিল—সে সব দু'শ বৎসরের মরচেধরা। তাদের মরচে ছাড়াতেই প্রায় দিন কাবার হয়ে গেল। সেদিন আমাদের আর রান্নাবাড়া হল না, যদিচ রাজবাড়ী থেকে প্রকাণ্ড সিধে এসেছিল। আমরা সকলে জলের ছিটে দিয়ে ছাতু তাল পাকিয়ে নিয়ে, গণ্ডা গণ্ডা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তা গলাধঃকরণ করলুম। সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় আমাদের ডাক পড়্ল—স্বয়ম্বরসভা পাহারা দেবার জন্য।

ভোজপুরিদের সঙ্গে লাঠিয়ালদের তফাৎ এই যে, লেঠেলরা খেতে না পেলে ডাকাত হয়, আর ভোজপুরিরা পাহারাওয়ালা।

সভাপর্ব্ব

বিয়ের সভা বসেছিল ঠাকুরবাড়ীতে, কারণ তার নাটমন্দিরে শ-পাঁচেক লোক হেলায় বসতে পারে। ঠাকুরবাড়ীতে ঢোকবার আগে বাইরের উঠানে দেখি লাঠিয়ালরা সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ এক নতুন মূর্ত্তি। এবার তারা সব কাপড় পরেছে, উত্তর বঙ্গের চাষার মেয়েদের মত বুক থেকে ঝুলিয়ে, আর সে কাপড়ের ঝুল হাঁটু পর্য্যন্ত। সকলেরই ডান হাতে পাঁচ হাত লম্বা লাঠি, কারও কারও হাতে আবার পুঁটিমাছধরা ছিপের মত সরু সরু লম্বা সড়কি, তার মুখে ইস্পাতের ফলাগুলো জিভের মত বেরিয়ে আছে। সে ত মানুষের জিভ্ নয়, সাপের দাঁত। আর সকলেরই বাঁ হাতে থাবাপ্রমাণ বেতের ঢাল। প্রথমে এদের দেখে চিনতেই পারিনি। মাথার চুল এখন আর তাদের কাঁধের উপর ঝুলছে না, ছাতার মত মাথা ঘিরে রয়েছে। শুনলুম, মাথার চুল দিনভর ময়দা দিয়ে ঘসে ঘসে ফুলিয়েছে। এই নাকি তাদের যুদ্ধের বেশ।

ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকে দেখি নাটমন্দির লোকে লোকারণ্য। আর সুমুখের ঠাকুরদালান খালি, সুধু দু'ধারে দু'সার চেয়ারে বরবাবুরা বসে আছেন। একধারে সাদা কাপড়ের উপর বড় বড় শালুর লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে 'কর্ম্মবীর', অন্যধারে একই ধাঁচে 'জ্ঞানবীর'। ঘোর মূর্খের দলরা হচ্ছে সব কর্ম্মবীর, ইংরেজীতে যাকে বলে Sportsman —তাদের কারও হাতে রয়েছে ক্রিকেট ব্যাট, কারও হাতে tennis racket, কারও হাতে boxing gloves, কারও হাতে hocky stick, কারও হাতে foot-ball। সুধু একজনের হাতে রয়েছে দেখলুম এক

হাতে লম্বা একটি খাগড়ার কলম, শুনলুম ইনি হচ্ছেন লিপিবীর। মধ্যে যেখানে চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে উঠতে হয়, সেখানটা ফাঁক। তার পরে জ্ঞানবীরদের আসন। এরা সকলেই ডক্টর,—সুধু কারও D-র পিছনে আছে L, কারও L. T. কারও S. C। কে কোন্ দলের লোক, তা তাদের মাথার উপরের placard না দেখলে বোঝা যায় না। দু-দলেরই রূপ এক। ব্যাং আর ফড়িং এ-দলেও ছিল, ও-দলেও ছিল। অথচ উভয় দলই পরস্পরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখছিলেন।

রাজাবাহাদুর নাটমন্দিরে ঢুকতেই একটি উচ্চাসনে অর্থাৎ High-Court-এর জজের চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর এক পাশে ছিল নটনারায়ণ, আর এক পাশে দেওয়ানজী। চণ্ডীমণ্ডপ ও নাটমন্দিরের মধ্যে যে গলিটা ছিল, আমি আমার দলবল নিয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সকলেরই মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে সাদা চাপকান, কোমরে তলওয়ার আর পায়ে নাগরা জুতো; সুধু আমার মাথায় পাগড়ি ছিল ডাইনে নীল বাঁয়ে লাল, আর একমাত্র আমার তলওয়ারে ছিল হাতির দাঁতের বাঁট। আমরা প্রথমে গিয়েই সব single file-এ দাঁড়িয়ে salute করলুম। তারপরে এই বলে অভিবাদন করলুম, "জিয়ে মহারাজ, জিয়ে মোতিওয়ালা, দোস্ত বাহাল, দুষ্‌মণ পয়মাল"। শুনে রাজাবাহাদুর খুব খুসী হলেন। তারপরে নটনারায়ণ হুকুম দিলেন—"জমাদার লীললাল সিং, পাহারাকো বন্দোবস্ত্ করো।" আমি "জো হুকুম" বলে, ঠাকুরবাড়ীর উত্তর দুয়ারে ছ-জন, দক্ষিণ দুয়ারে ছ-জন, পশ্চিম দুয়ারে ছ জনকে মোতায়েন করে দিলুম। আর আমি দাঁড়ালুম চণ্ডীমণ্ডপের নীচে, যেখানে মাথার উপরে বড় বড় ইংরেজী হরফে লেখা ছিল "None but the brave deserve the fair"। আর রামরঙ্গিলা সিংকে রাজাবাহাদুরের সুমুখে খাড়া করে দিলুম। তার কারণ সে ছোকরা ছিল বহুৎ খবসুরৎ।

মিনিট পাঁচেক পরে নটনারায়ণের হুকুমে একটা বাব্‌রিচুলো ছোকরা-ভাণ্ডারী মহা শঙ্খধ্বনি করলে, আর তৎক্ষণাৎ অন্দরমহলের দুয়ার দিয়ে মালশ্রী চণ্ডীমণ্ডপে এসে হাজির হলেন; বিয়ের কনে সেজে। দেখলুম তার বিশেষ কিছু বদল হয়নি, সুধু লম্বায় একটু বেড়েছে, আর গায়ের রঙ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। সঙ্গে আছেন একটি মহিলা, যেমন বেঁটে তেমনি রোগা, যেমন কালো, তেমনি ফ্যাকাসে,—এক কথায় শ্রীমতী মূর্ত্তিমতী dyspepsia। তাঁর হাতে একখানা সোনার থালার উপরে একটি বেল ফুলের গোড়েমালা। পরে শুনেছি ইনি হচ্ছেন মিস্ বিশ্বাস, জাত খৃষ্টান, পাস M. A., মালার নতুন মাষ্টারণী। মালা এসে প্রথমে এক নজরে সভাটি দেখে নিলে, তারপর মিস্ বিশ্বাসকে কি ইঙ্গিত করলে। আর মিস্ বিশ্বাস একমুখ হেসে অগ্রসর হ'তে সুরু করলেন।

প্রথমেই তিনি ব্যাটধারীর সুমুখে দাঁড়িয়ে মালশ্রীকে সম্বোধন করে বললেন—

এই বীর যুবকদের কুলশীলের পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। রাজাবাহাদুর যে সমান ঘর থেকে সমান বরের আমদানী করেছেন, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এদের রূপ তুমি নিজের চোখ দিয়ে দেখ, আর গুণ আমার মুখে শোনো। ইনি হচ্ছেন স্বনামধন্য বাসু বোস, ওরফে দ্বিতীয় রঞ্জি। ঐ যে হাতে ব্যাট দেখছ, ওর স্পর্শে বল্ অসীমে চলে যায়। তুমি যদি ওঁকে বরণ করো ত উনি তার পরদিনই নববধূ কোলে করে বিলেত চলে যাবেন,—Lord's Cricket Ground-এ ম্যাচ খেলতে। আর উনি যখন Century-র পর Century করবেন, তখন স্বয়ং রাজা ওঁর handshake করবেন, ও রাণী তোমার।

এ সব শুনে মালশ্রী বললে—Advance। মিস্ বিশ্বাস অমনি দ্বিতীয় বীরের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বললেন—

ইনি হচ্ছেন নেড়া দত্ত। এঁর তুল্য Goal-keeper ভূ-ভারতে আর নেই। ইনি বল্ ঠেকান সুধু মাথা দিয়ে। তাই এঁর মাথায় একটি চুল নেই, সব বলের ধাক্কায় ঝরে পড়েছে। যখন গোরার পায়ের লাথি খেয়ে বল্ ঊর্দ্ধশ্বাসে মরি-বাঁচি করে ছোটে, তখন এঁর মাথার গুঁতোয় তা চৌচির হ'য়ে যায়—অন্যের হলে মাথা চৌচির হয়ে যেত। তুমি যদি এঁকে বরণ করো ত ইনি তোমাকে ঐ অপূর্ব্ব ও অমূল্য মাথায় করে রাখ্‌বেন।

মালা আবার বল্‌লে—Advance।

মিস্ বিশ্বাস তৃতীয় বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে সুরু করলেন—ইনি হচ্ছেন ঘুসি ঘোস। ঐ যে ওঁর দু'হাত জোড়া দুটো পাঁওরুটি রয়েছে, ও bread নয়—stone। ও-রুটি যার মুখে পড়ে, তার একসঙ্গে দাঁত ভাঙ্গে আর দাঁতকপাটি লাগে। তুমি যদি এঁকে বরণ করো তাহলে ঐ রুটির অন্তরে যে রক্তমাংসের হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তোমার পাণি গ্রহণ করবেন।

আবার শোনা গেল—Advance। মিস্ বিশ্বাস চতুর্থ বীরের সুমুখে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—উনি হচ্ছেন নগা নাগ, the world-famous hockey champion, আর তার লক্ষণ সব ওঁর দেহেই রয়েছে। ওঁর শরীর যে কাঠ হয়ে গিয়েছে সে শুধু দৌড়ে দৌড়ে, আর ওঁর বর্ণ যে মলিন শ্যাম, সে কতকটা রোদে পুড়ে আর অনেকটা রাঁচির কোলজাতীয় হকি-খেলোয়াড়দের ছোঁয়াচ লেগে। মহাবীরের রূপ এইরকমই হয়। তাদের দেহের গুণ রূপকে ছাপিয়ে ওঠে।

জোর গলায় হুকুম এল—Advance.

মিস্ বিশ্বাস পঞ্চম বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—এর নাম খঞ্জন মিত্তির। Tennis-ground-এ ইনি খঞ্জনের মত লাফিয়ে বেড়ান

বলে, লোকে এঁর পিতৃদত্ত নাম রঞ্জন খণ্ডে খঞ্জন করেছে। এঁর চেহারাটা যে একটু মেয়েলিগোছের, তাঁর কারণ টেনিস খেলায় ভীমের মত বলের দরকার নেই, কৃষ্ণের মত ছলই যথেষ্ট। এ খেলায় muscle চাইনে, চাই শুধু nerve।

মালা বল্লে—Advance। অতঃপর মিস্ বিশ্বাস লিপিবীরের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বল্লেন—

ইনি হচ্ছেন বীর নৃসিংহ ভঞ্জ, প্রসিদ্ধ "তেজপত্রে"র সম্পাদক। প্রথমে ইনি ছিলেন গত সবুজপত্রের সহকারী সম্পাদক, সে কাগজে বীরবলের ব্যঙ্গের ভয়ে ইনি মন খুলে হাত ঝেড়ে লিখতে পারেন নি। তেজ পত্র যে কতদূর তেজপূর্ণ, তা ত তুমি জানো, কারণ তুমি তা পড়েছ। তার দু' ছত্র পড়লেই পাঠকের শিরায় উপশিরায় ধমনীতে উপধমনীতে রক্তের স্রোত উজান বইতে বইতে তার মাথায় চড়ে যায়। তখন পাঠকের অন্তরে আর ধৈর্য্য থাকে না, উথলে ওঠে সুধু বীর্য্য। The pen is mightier than the sword, এ কথা যে সত্য—তা হাতে-কলমে প্রমাণ করেছে ওঁর হাতের ঐ কলমটা।

মালা হুকুম করলে—Forward।

মিস্ বিশ্বাস হাতে সোনার থালা ও ফুলের মালা নিয়ে শেষ কর্ম্মবীর ও প্রথম জ্ঞানবীরের মধ্যে যে হাত দশেক ব্যবধান ছিল, ধীরে ধীরে তা অতিক্রম করতে লাগলেন; এদিকে মালশ্রী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে নিজের গলার মুক্তোর হার খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। তারপর আমার বাঁ পাশে এসে আমার বাঁ হাত ধরে দাঁড়ালে। আর আমি আমার অসি খাপমুক্ত করতে বাধ্য হলুম। এ ব্যাপার দেখে সভাসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারও মুখে টু শব্দটি নেই। তারপর হঠাৎ রামরঙ্গিলা ছোকরা চীৎকার করে তার ভাইব্রদ্রীকে জানালে, 'মালা

হামলোককা মিল গিয়া, আর এইসা তেইসা মালা নেই - একদম মোতিকো মালা'। অমনি রাম সিংদের দল সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—"জয় নীললাল সিংকো জয়"!

রাজাবাহাদুর এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। আমার দলবলের এই ক্ষত্রিয়োচিত জয়জয়কার শুনে তিনি বললেন—

"ই বাৎ হো নেই সেক্তা"।

রামরঙ্গিলা অমনি বললে—

"অগর হো নেই সেক্তা তো হুয়া কৈসে?"

আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে বললুম"তোম চুপ রহো"। আর রাজাসাহেবকে সম্বোধন করে বল্লুম—"হুজুর, ইন্‌কো লেড়কপন্‌কা চঞ্চলতা মাপ কিজিয়ে"। অমনি আবার সব চুপ হয়ে গেল।

তখন রাজাবাহাদুর বীরের দলকে সম্বোধন করে বললেন:

"হে বীরগণ, এখন তোমাদের কর্ত্তব্য করো। দরওয়ান বেটার হাত থেকে মালাকে ছিনিয়ে নেও।"

এ কথা শুনে কর্ম্মবীররা চুপ করে রইলেন, কিন্তু জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন উঠে বললেন—

"মহাশয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনই কর্ত্তব্য নেই। আপনার মেয়ে ত আমাদের প্রত্যাখ্যান করেনি, করেছে কর্ম্মবীরদের। ওঁরাই এখন যথা বিহিত করুন।"

কর্ম্মবীররাও নড়বার চড়বার কোনও লক্ষণ দেখালেন না। সুধু লিপিবীর বাঁ হাত দিয়ে মিস্ বিশ্বাসের অঞ্চল ধরে পাশের বীরকে ঠেলতে লাগলেন। লিপিবীরের ঠেলাতে অস্থির হয়ে খঞ্জন মিত্তির উঠে বললেন—"রাজাবাহাদুর, এত playground নয়—battlefield। আমরা নিরস্ত্র,

ওরা সশস্ত্র; আমাদের হাতে আছে শুধু ব্যাটবল, আর ওদের হাতে আছে তলওয়ার। এ অবস্থায় আমরা যুদ্ধং দেহি বলতে পারিনে। এই দু'মিনিট আগে শুনলুম—Pen is mightier than the sword;—তা যদি হয় ত তেজপত্রের সম্পাদক কলম হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

ঐ প্রস্তাবে লিপিবীর মিস্ বিশ্বাসের পিছনে আশ্রয় নিলে।

এই সব ব্যাপার দেখেশুনে মালা আমার কানে কানে বললে—"দেখলে বাবার ফরমায়েসী বীরের দল?"

তারপর রাজাবাহাদুর বললেন, "দেখছি তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না, আমার মেয়ে আমিই উদ্ধার করব।" এর পর তিনি নটনারায়ণের কানে কানে কি বললেন। সে অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আর মিনিট খানেকের মধ্যে লেঠেলের সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। রাজাবাহাদুর বললেন, "যাও সরিতুল্লা, যাও। তোমরা গিয়ে ডাক ছাড়ো, তারপর যেমন যেমন দরকার হবে তেমনি হুকুম দেব।" সরিতুল্লা "হুজুর মালিক" বলে রাজাবাহাদুরের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়ে চলে গেল। সে বেরিয়ে যাবা মাত্র লেঠেলরা সকলে গলা মিলিয়ে "লা আল্লা ইল আল্লা মহম্মদ রসুল-উ-উ-উ-উ-ল" বলে ভীষণ জিগির ছাড়লে যেন মনে হল এইবার সভায় ডাকাত পড়বে। আর তাই শুনে রামসিংদের দল "সীতাপতি রামচন্দ্রজিকো জয়" বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। মনে হল, এইবার দুইদলে যুদ্ধ বাধে।

জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে রাজাবাহাদুরকে বললেন—"মহাশয় করছেন কি, একটা হিন্দু মুসলমানের riot বাধাবেন না কি? এমন জান্‌লে ত এখানে কখনো আসতুম না, এখন বেরতে পারলে বাঁচি। যা করতে হয় করুন, কিন্তু

non-violent উপায়ে।" রাজাবাহাদুর উত্তর করলেন—"শান্ত উপায় অবলম্বন করতে আমি সদাই প্রস্তুত, অবশ্য তা যদি ক্ষাত্রধর্ম্মের অবিরোধী হয়।" আমি দেখলুম আর বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা কিছু নয়। অমনি আমার দলবলকে হুকুম দিলুম বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে। যেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, অমনি আমি আমার মাথার পাগড়ি ও কোমরের বেল্ট খুলে ফেললুম। রাজাবাহাদুর আমার দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—"কে, নীললোহিত নাকি?"* আমি বললুম "আজ্ঞে আমি নীললোহিত শর্ম্মা।" আমার পরিচয় পেয়েই বাসু বোস, ঘুসি ঘোষ, নেড়া দত্ত, নগা নাগ ও খঞ্জন মিত্র সমস্বরে চীৎকার করে উঠল,— "Three cheers for the conquering hero", তারপর হুরে হুরে শব্দে সভাগৃহ কেঁপে উঠল। দেখলুম এরা সত্যসত্যই sportsmen বটে। এদের মধ্যে একমাত্র লিপিবীর ক্রোধকম্পান্বিতকলেবর হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—"এ মূর্খের দলে ঢোকাই আমার ভুল হয়েছিল। রাজা-বাহাদুরের মত বাঙালীদের আজও এ জ্ঞান হয়নি যে, গোঁয়ার ও বীর এক জিনিষ নয়। যাই একবার কলকাতায় ফিরে, এ বিষয়ে একটি চুটিয়ে আর্টিকেল লিখব"। তিনি মনের আক্ষেপ এই ক'টি কথায় প্রকাশ করে, দ্রুতপদে জ্ঞানবীরদের কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে তাদের কানে কি মন্ত্র দিতে লাগলেন।

একটু পরে রাজাবাহাদুর অতি ধীর গম্ভীর বুনিয়াদী গলায় বললেন—

"আমার মেয়ে যখন স্বেচ্ছায় স্বয়ং তোমাকে বরণ করেছে, তখন এ বিবাহে আমার কোন ন্যায্য আপত্তি থাকতে পারে না। আমি শুধু ভাবছি, তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান আর মালশ্রী ক্ষত্রিয়-কন্যা; সুতরাং এ বিবাহ কি শাস্ত্রসঙ্গত হবে?"

আমি বললুম—

পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়॥
দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ, তথা তথা এই রঙ্গ॥

এ কথা শুনে জ্ঞানবীরদের দলের একজন দোজবরে D. L. দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—

"এ বিয়ে দিতে চান দিন, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এইটুকু সুধু জেনে রাখবেন যে তা সম্পূর্ণ illegal হবে। মনুর মতেও তাই, মিতাক্ষরা মতেও তাই। উদ্বাহতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র authority নন্, কারণ বিদ্যাসুন্দরকে কোনমতেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলা যায় না। যদি এ বিষয়ে শেষ কথা আর সার কথা জানতে চান ত Sir Gurudas-এর Marriage & Stridhan পড়ুন। আর ও-বই পড়া আপনার নিতান্ত দরকার, কারণ এ ক্ষেত্রে শুধু marriage নয়, স্ত্রীধনের কথা রয়েছে।

আমি জবাব দিলুম "শাস্ত্রফাস্ত্র জানিওনে, মানিওনে। কারণ

আমি যে হই, সে হই, আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে মালা ছাড়িবার নই॥
মোর মালা মোরে দেহ, মোর মালা মোরে দেহ,
জাতি লয়ে থাক তুমি, আমি যাই গেহ॥"

রাজাবাহাদুর আমার কথা শুনে থ হয়ে রইলেন। এর পর প্রমাণ পেলুম যে, পটলডাঙ্গার পণ্ডিতেরা ঘোর পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু গড়ের মাঠের খোলোয়াড়রা ঘোর মূর্খ নয়। শাস্ত্রজ্ঞান উভয়েরই প্রায় তুল্যমূল্য, আর শাস্ত্রের প্যাঁচ কাটাতে জানে কর্ম্মবীররা, আর জানে না জ্ঞানবীররা।

রাজাবাহাদুর উভয়সঙ্কটে পড়েছেন দেখে খঞ্জন মিত্তির চেঁচিয়ে বললেন—

"অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। সুতরাং এ বিবাহ দিলে আপনার পণও রক্ষা হবে, জাতও রক্ষা হবে।"

রাজাবাহাদুর এই সুসংবাদ শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। D. L-টি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আইনের আর এক ফেঁকড়া তুললেন। তিনি বলিলেন—

"যদিচ ওরকম বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ, তবুও তা শাস্ত্রসঙ্গত হতে পারে, যদি ওঁর পূর্ব্ববিবাহিত স্ত্রী ব্রাহ্মণী হন।"

রাজাবাহাদুর অমনি আমার দিকে চাইলেন। আমি বললুম, "আজ্ঞে আমার প্রথম স্ত্রী ত আমি স্বয়ম্বর সভা থেকে সংগ্রহ করিনি। সে শুধু ব্রাহ্মণী নয়, উপরন্তু কুলীন-কন্যা, লক্ষ্মীপাশার মেয়ে সুতরাং সপত্নীতে তার আপত্তি নেই।" যেই এ কথা বলা, অমনি মালশ্রী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বাপের কাছে ছুটে গিয়ে বল্লে—

"এ বিবাহ আমি কিছুতেই করব না, প্রাণ গেলেও নয়। স্বামী নিয়ে partnership business!"

আমি বললুম—"মালশ্রী, আমি বিপদে পড়ে মিথ্যে কথা বলেছি। আমি যে কার্ত্তিক ছিলুম, সেই কার্ত্তিকই আছি"। মালশ্রী উত্তর করলে—

"তাহলে সেই কার্ত্তিকই থাকো। মিথ্যাবাদীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করব না, প্রাণ গেলেও নয়"।

আমি বললুম—"তাই সই, আমি চিরকুমারই থাক্‌ব। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।"

মালশ্রী ইতিমধ্যে দেখি রণচণ্ডী হয়ে উঠেছে। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে বললে—"আমিও চিরকুমারী হয়ে থাকব।

এরপর আমি পুরুষ-বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে নারী আন্দোলনে যোগ দেব।”

এ কথা বলেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

এর পর আমি সটান ষ্টেশনে চলে গেলুম, একলা হেঁটে নয়, মোটর গাড়ীতে নটনারায়ণের সঙ্গে।

রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, “মালার কি হল?” নীললোহিত উত্তর করলেন—“সে খোঁজ তুমি করোগে। আমি ঘটক নই।” এর পর রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলেন—“আর মোতির মালাটা?” নীললোহিত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—

“সেটি তোমার চাই নাকি? তুমি দেখছি রাম-রঙ্গিলার মাসতুতো ভাই। মালা গেল তাতে দুঃখ নেই, মোতির মালা হারাল এইটেই হচ্ছে জবর ট্রাজেডি। বাঙালী জাতটে হাড়ে ছিবলে। কোনও serious জিনিষ তোমরা ভাবতেও পারো না, বুঝতেও পারো না। তোমাদের উপযুক্ত সাহিত্যে হচ্ছে প্রহসন। যাও সকলে মিলে পড়ো গিয়ে ‘বিবাহ বিভ্রাট’।”

এই শেষ কথা বলে নীললোহিত কপালে হাত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, মাথার ঘাম কি চোখের জল মুছতে মুছতে, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমরা সকলে হো হো করে হেসে উঠলুম। কারণ নীললোহিতের ধমক সত্ত্বেও ব্যাপারটাকে ট্রাজেডি বলে আমরা বুঝতে পারলুম না, আমাদের মনে হল, ওটি একটি **roaring farce.**

———

অদৃষ্ট

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ফরাসী থেকে "অদৃষ্ট" নামধেয় যে গল্পটি অনুবাদ করেছেন, তার মোদ্দা কথা এই যে, মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের মন্দ কর্‌তে চাইলেও দৈবের কৃপায় তার ফল ভাল হয়।

এ কিন্তু বিলেতী অদৃষ্ট।

এদেশে মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের ভাল কর্‌তে চাইলেও দৈবের গুণে তার ফল হয় মন্দ। এদেশী অদৃষ্টের একটি নমুনা দিচ্ছি। এ গল্পটি সত্য—অর্থাৎ গল্প যে পরিমাণ সত্য হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ সত্য,—তার চাইতে একটু বেশিও নয়, কমও নয়।

(১)

এ ঘটনা ঘটেছিল পালবাবুদের বাড়ীতে। এই কলকাতা সহরে খেলারাম পালের গলিতে, খেলারাম পালের ভদ্রাসন কে না জানে? অত লম্বা-চৌড়া আর অত মাথা-উঁচু-করা বাড়ী যিনি চোখে কম দেখেন, তাঁর চোখও এড়িয়ে যায় না। দূর থেকে দেখ্‌তে সেটিকে সংস্কৃত কলেজ বলে' ভুল হয়। সেই সার সার দোতলা সমান উঁচু, করিন্থিয়ান থাম, সেই গড়ন, সেই মাপ, সেই রং, সেই ঢং। তবে কাছে এলে আর সন্দেহ থাকে না যে, এটি সরস্বতীর মন্দির নয়, লক্ষ্মীর আলয়। এর সুমুখে দীঘি নেই, আছে মাঠ, তাও আবার বড় নয়, ছোট; গোল নয়, চৌকোণ। এ ধাঁচের বাড়ী অবশ্য কলকাতা সহরে বড় রাস্তায় ও গলি-ঘুঁজিতে আরো দশ-বিশটা মেলে; তবে খেলারামের বসতবাটীর সুমুখে যা আছে, তা কলিকাতা সহরের অপর কোনো বনে'দী ঘরের ফটকের সামনে নেই।

দুটি প্রকাণ্ড সিংহ তার সিংহদরজার দু'ধার আগলে বসে' আছে। তার একটিকে যে আর সিংহ বলে' চেনা যায় না, আর পথচলতি লোকে বলে – বিলেতী শেয়াল, তার কারণ, বয়সের গুণে তার ইঁটের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, আর তার চূণবালির জটা খসে পড়েছে। কিন্তু যেটির পৃষ্ঠে সোয়ারি হয়ে, নাকে নথ-পরা একটি পানওয়ালী সকাল-সন্ধ্যে পয়সায় পাঁচটি করে' খিলি বেচে, সেটিকে আজও সিংহ বলে' চেনা যায়।

(২)

এই সিংহ দুটির দুর্দ্দশা থেকেই অনুমান করা যায় যে, পাল বাবুদেরও ভগ্ন দশা উপস্থিত হয়েছে। বাইরে থেকে যা অনুমান করা যায়, বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাল বাবুদের নাচঘরের জুড়ি নাচঘর কোম্পানীর আমলে কলকাতায় আর একটিও ছিল না। মেজবাবু অর্থাৎ খেলারামের মধ্যম পুত্র, কলকাতার সব ব্রাহ্মণ কায়স্থ বড় মানুষদের উপর টেক্কা দিয়ে সে ঘর বিলেতি-দস্তুর সাজিয়েছিলেন। পাশে পাশে টাঙানো আর গায়ে গায়ে ঠেকানো ঝাড়ে ও দেওয়ালগিরিতে সে ঘর চিক্‌মিক্ করিত, চক্‌মক্ করত। আর এদের গায়ে যখন আলো পড়ত, তখন সব বালখিল্য ইন্দ্রধনু তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমে ঘরময় খেলা করে' বেড়াত। সে এক বাহার! তারপর সাটিনে ও মখমলে মোড়া কত যে কৌচ-কুর্সি সে ঘরে জমায়েত হয়েছিল, তার আর লেখাজোখা নেই। কিন্তু আসলে দেখবার মত জিনিস ছিল সেই নাচঘরের সুমুখের বারান্দা। ইতালি থেকে আমদানী-করা তুষার-ধবল, নবনীতসুকুমার মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত, প্রমাণ সাইজের স্ত্রীমূর্ত্তিসকল সেই বারান্দার দু'ধারে সার বেঁধে দিবারাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত—প্রতিটি এক একটি বিচিত্র ভঙ্গীতে।

তাদের মধ্যে কেউ বা স্নান করতে যাচ্ছে, কেউ বা সস্থ নেয়ে উঠেছে, কেউ বা সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে, কেউ বা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ বা দুহাত তুলে মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে' বাঁধছে, কেউ বা বাঁ হাতখানি ধনুকাকৃতি করে' সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে ;—দেখলে মনে হ'ত, স্বর্গের বেবাক অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হয়ে মেজ-বাবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। সামান্য লোকদের কথা ছেড়ে দিন, এ ভুল মহা মহা পণ্ডিতদেরও হ'ত। তার প্রমাণ—পাল-প্রাসাদের সভাপণ্ডিত স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয় একদিন বলেছিলেন,—"মেজবাবুর দৌলতে মর্ত্যে থেকেই স্বর্গ চোখে দেখ্‌লুম। এই পাষাণীরা যদি কারো স্পর্শে সব বেঁচে ওঠে, তাহ'লে এ পুরী সত্যসত্যই অমরাপুরী হয়ে ওঠে"। এ কথা শুনে মেজবাবুর জনৈক পেয়ারা মোসাহেব বলে' ওঠেন,—"তাহ'লে বাবুকে একদিনেই ফতুর হ'তে হ'ত—শাড়ীর দাম দিতে।" এ উত্তরে চারিদিক থেকে হাসির তুফান উঠল। এমন কি, মনে হ'ল যে, ঐ সব পাষাণ-মূর্ত্তিদেরও মুখে চোখে যেন ঈষৎ সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলা বাহুল্য যে, এই কলকাতা সহরের উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচীদের নাচে গানে প্রতি সন্ধ্যে এ নাচঘর সরগরম হয়ে উঠত। আর আজকের দিনে তার কি অবস্থা ?—বল্‌ছি।

(৩)

এই নাচঘরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের অতিকায় লেখবার টেবিল আর খানকতক ভাঙ্গা চৌকি। মেঝেতে পাতা রয়েছে একখানি বাহাত্তর বৎসর বয়সের একদম রঙ-জ্বলা এবং নানাস্থানে ইঁদুরে-কাটা কারপেট। এ ঘরে এখন ম্যানেজার সাহেব দিনে আফিস করেন, আর রাত্তিরে সেখানে নর্ত্তন হয় ইঁদুরের—কীর্ত্তন হয় ছুঁচোর।

এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ জানতে হ'লে পালবংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনা চাই। সে ইতিহাস আমি আপনাদের সময়ান্তরে শোনাব। কেননা, তা যেমন মনোহারী, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এ কথার ভিতর সে কথা ঢোকাতে চাই নে এই জন্য যে, আমি জানি যে. উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের খিচুড়ি পাকালে, ও-দুয়ের রসই সমান কষ হয়ে ওঠে।

ফল কথা এই যে, পাল বাবুদের সম্পত্তি এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু সরিকী বিবাদে তা উচ্ছন্ন যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ভাঙ্গা ঘর আবার গড়ে' তোলবার ভার আপাতত; এখন কমন-ম্যানেজারের হাতে পড়েছে। এই ভদ্রলোকের আসল নাম—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু লোকসমাজে তিনি চাটুয্যে-সাহেব বলেই পরিচিত। এর কারণ, যদিচ তিনি উকীল, ব্যারিষ্টার নন, তাহ'লেও তিনি ইংরেজি পোষাক পরেন—তাও আবার সাহেবের দোকানে তৈরী। চাটুয্যে-সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগাগোড়া পরীক্ষা একটানা ফার্ষ্ট ডিভিসনেই পাশ করে' এসেছেন, কিন্তু আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাশ করতে পারলেন না। এর কারণ, তাঁর Literature-এ taste ছিল, অন্ততঃ এই কথা ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারলেন না যে, পক্ষিরাজকে ছক্কড়ে জুতলে কেন না সে তা টানতে পারবে। তবে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে' স্বামীর কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি, নিজের কপালের দোষ দিয়েই বসে' ছিলেন। যখন সাত বৎসর বিনে রোজগারে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়েসও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হবার আশা ত্যাগ করে' মাসিক তিনশ' টাকা বেতনে পাল বাবুদের জমিদারী সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হ'লেন। এও দেশী অদৃষ্টের একটা ছোটখাটো উদাহরণ। বাঙ্গালী উকীল না হয়ে সাহেব

কৌচুলি হ'লে তিনি যে Bar-এ ফেল করে' Bench-এ প্রমোশন পেতেন, সে কথা ত আপনারা সবাই জানেন। যার এক পয়সার প্র্যাকটিস নেই, সে যে একদম তিনশ' টাকা মাইনের কাজ পায়, এ দেশের পক্ষে এই ত একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাঁর কপাল ফিরল কি করে' জানেন?—ছেরেপ মুরুব্বির জোরে। তিনি ছিলেন একাধারে বনে'দী ঘরের ছেলে আর বড়মানুষের জামাই—অর্থাৎ তাঁর যেমন সম্পত্তি ছিল না, তেমনি ছিল সহায়।

(৪)

বলা বাহুল্য, জমিদারী সম্বন্ধে চাটুয্যে-সাহেবের জ্ঞান আইনের চাইতেও কম ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীতে B. L. পাশ করেন, সুতরাং এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, আইনের অন্ততঃ পুঁথিগত বিদ্যে তাঁর পেটে নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু কি হাতে-কলমে কি কাগজে-কলমে তিনি জমিদারী বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান কখনো অর্জ্জন করেন নি। তাই তিনি তাঁর আত্মীয় ও পরমহিতৈষী জনৈক বড় জমিদারের কাছে এ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তা অমূল্য। কেননা, তিনি ছিলেন একজন যেমনি হুঁসিয়ার, তেমনি জবরদস্ত জমিদার। তারপর জমিদার মহাশয় ছিলেন অতি স্বল্পভাষী লোক। তাই তাঁর আদ্যোপান্ত উপদেশ এখানে উদ্ধৃত করে' দিতে পারছি। জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত,, আমার বিশ্বাস অনেকেরই কাজে লাগবে। তিনি বল্লেন,—"দেখ বাবাজী, যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল শালিয়ানা দু'লক্ষ টাকা, আমার হাতে তা এখন চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমি যে জমিদারীর উন্নতি করতে জানি, এ কথা আমার শত্রুরাও স্বীকার করে;—আর দেশে আমার

শত্রুরও অভাব নেই। জমিদারী করার অর্থ কি জানো?—জমিদারীর কারবার জমি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ও হচ্ছে একরকম ঘোড়ায় চড়া। লোকে যদি বোঝে যে, পিঠে সোয়ার চড়েছে, তাহ'লে তাকে আর ফেলবার চেষ্টা করে না। প্রজা হচ্ছে জমিদারীর পিঠ, আর আমলা-ফয়লা তার মুখ। তাই বল্‌ছি, প্রজাকে সায়েস্তা রাখ্‌তে হবে খালি পায়ের চাপে; কিন্তু চাবুক চালিয়ো না, তাহ'লেই সে পুস্তক ঝাড়বে আর অমনি তুমি ডিগ্‌বাজি খাবে। অপরপক্ষে আমলাদের বাগে রেখে রাশ কড়া করে' ধরো, কিন্তু সে রাশ প্রাণপণে টেনো না, তা-হ'লেই তারা শির-পা কর্‌বে আর অমনি তুমি উল্টো ডিগ্‌বাজি খাবে। এক কথায় তোমাকে একটু রাশভারি হ'তে হবে আর একটু কড়া হ'তে হবে। বাবাজী, এ ত ওকালতি নয় যে, হাকিমের সুমুখে যত নুইয়ে পড়বে নেতিয়ে পড়বে, আর যত তার মনযোগানো কথা কইবে, তত তোমার পসার বাড়বে। ওকালতি করার ও জমিদারী করার কায়দা ঠিক উল্টো উল্টো।"

এ কথা শুনে চাটুয্যে সাহেব আশ্বস্ত হলেন; মনে মনে ভাবলেন যে, যখন তিনি ওকালতিতে ফেল করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই জমিদারীতে পাশ কর্‌বেন। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর একটু ধোঁকাও রয়ে গেল। তিনি জানতেন যে, তাঁর পক্ষে রাশভারি হওয়া অসম্ভব। তাঁর চেহারা ছিল তার প্রতিকূল। তিনি ছিলেন একে মাথায় ছোট, তার উপর পাতলা, তার উপর ফর্শা, তারপর তাঁর মুখটি ছিল স্ত্রীজাতির মুখমণ্ডলের ন্যায় কেশহীন—অবশ্য হাল-ফেসান অনুযায়ী দু'সন্ধ্যা স্বহস্তে ক্ষৌর-কার্য্যের প্রসাদে। ফলে, হঠাৎ দেখতে তাঁকে আঠারো বৎসরের ছোকরা বলে' ভুল হ'ত। রাশভারি হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি স্থির কর্‌লেন যে, তিনি গম্ভীর হবেন। মধুর অভাবে গুড়ে যেমন দেবার্চ্চনার

কাজ চলে' যায়, তিনি ভাবলেন, রাশভারি হ'তে না পেরে গম্ভীর হ'তে পারলেই জমিদারী শাসনের কাজ তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

তারপর এও তিনি জানতেন যে, মানুষের উপর কড়া হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। এমন কি, মেয়েমানুষের উপরও তিনি কড়া হতে পারতেন না। তাই তিনি আপিসে নানারকম কড়া নিয়মের প্রচলন করলেন, এই বিশ্বাসে যে, নিয়ম কড়া হলেই কাজেরও কড়াক্কড় হবে। তিনি আপিসে ঢুকেই হুকুম দিলেন যে, আমলাদের সব ঠিক এগারটায় আপিসে উপস্থিত হ'তে হবে, নইলে তাদের মাইনে কাটা যাবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে সেরেস্তায় একটু আমলা-তান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু চাটুয্যে-সাহেব তাতে এক চুলও টল্‌লেন না, আন্দোলনও থেমে গেল।

(৫)

পাল-সেরেস্তার আমলাদের চিরকেলে অভ্যাস ছিল, বেলা বারোটা সাড়ে-বারোটার সময় পান চিবতে চিবতে আপিসে আসা, তারপর এক ছিলিম গুড়ুক টেনে কাজে বসা। মুনিব যেখানে বিধবা আর নাবালক —সেখানে কর্ম্মচারীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু তারা যখন দেখলে যে, ঘড়ির কাঁটার উপর হাজির হ'লেই হুজুর খুসি থাকেন, তখন তারা একটু কষ্টকর হ'লেও বেলা এগারটাতে হাজিরা সই করতে সুরু করে' দিলে। অভ্যেস বদলাতে আর কদিন লাগে?

মুস্কিল হ'ল কিন্তু প্রাণবন্ধু দাসের। এ ব্যক্তি ছিল এ কাছারির সবচেয়ে পুরাণো আমলা। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে বিশ বৎসর কাল সে এই ষ্টেটে একই পোষ্টে একই মাইনেতে বরাবর কাজ করে' এসেছে। এতদিন যে তার চাকরী বজায় ছিল, তার কারণ—সে ছিল

অতি সৎলোক, চুরি-চামারির দিক দিয়েও সে ঘেঁসত না। আর তার মাইনে যে কখনও বাড়ে নি, তার কারণ সে ছিল কাজে অতি ঢিলে।

প্রাণবন্ধু কাজ ভালবাসত না, পৃথিবীতে ভালবাসত শুধু দুটি জিনিষ; —এক তার স্ত্রী, আর এক তামাক। এই ঐকান্তিক ভালবাসার প্রসাদে তার শরীরে দুটি অসাধারণ গুণ জন্মেছিল। বহুদিনের সাধনার ফলে তার হাতের লেখা হয়েছিল যেরকম চমৎকার, তার সাজা তামাকও হ'ত তেমনি চমৎকার।

আপিসে এসে তার নিত্যনিয়মিত কাজ ছিল—সর্ব্বপ্রথমে তার স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখা। গোড়ায় "প্রিয়ে, প্রিয়তরে, প্রিয়তমে" এই সম্বোধন এবং শেষে "তোমারই প্রাণবন্ধু দাস" এই দ্ব্যর্থ-সূচক স্বাক্ষরের ভিতর, প্রতিদিন ধীরে সুস্থিরে ধরে' ধরে' পূরো চার পৃষ্ঠা চিঠি লিখ্তে লিখ্তে তার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মত হয়ে উঠেছিল। এই জন্য আপিসের যত দলিলপত্র তাকেই লিখতে দেওয়া হ'ত। এই অক্ষরের প্রসাদেই তার চাকরীর পরমায়ু অক্ষয় হয়েছিল।

তারপর প্রাণবন্ধু ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খেতেন—অবশ্য নিজ হাতে সেজে। পরের হাতে সাজা-তামাক খাওয়া তাঁর পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল—পরের হাতের লেখা-চিঠি তার স্ত্রীকে পাঠান তাঁর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল। তিনি কল্কের প্রথমে বেশ ক'রে ঠিক্‌রে দিয়ে তার উপর তামাক এলো করে' সেজে তার উপর আল্‌গোছে মাটির তাওয়া বসিয়ে, তার উপর আড় করে' স্তরে স্তরে টীকে সাজিয়ে, তার পর সে টীকের মুখাগ্নি করে' হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে' ধীরে ধীরে তামাক ধরাতেন। আধঘণ্টা তদ্বিরের কম যে আর ধোঁয়া গোল হয়ে, নিটোল হয়ে, মোলায়েম হয়ে, নলের মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোয় না, এ কথা যারা কখনো হুঁকো টেনেছে, তাদের মধ্যে কে না জানে?

এই চিঠি লেখা আর তামাক সাজার ফুরসতে প্রাণবন্ধু আপিসের কাজ করতেন এবং সে কাজও তিনি করতেন অন্যমনস্কভাবে। বলা বাহুল্য যে সে ফুরসৎ তাঁর কত কম ছিল। এর চিঠি ওর খামে পুরে দেওয়া তাঁর একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ সত্ত্বেও সমগ্র সেরেস্তা যে তাঁকে ছাড়তে চাইত না. সত্য কথা বলতে গেলে তার আসল কারণ এই যে, প্রাণবন্ধু সেরেস্তায় হুঁকোবরদারীর কাজ করত—আর সবাই জানত যে, অমন হুঁকোবরদার মুচিখোলার নবাব-বাড়ীতেও পাওয়া দুষ্কর। তাঁর করস্পর্শে দা-কাটাও ভেলসা হয়ে, খরসানও অম্বুরি হয়ে উঠত।

প্রাণবন্ধুর উপরে সকলে সন্তুষ্ট থাক্‌লেও, তিনি সকলের উপর সমান অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর মাইনে যে বাড়ে না, সে তিনি চোর নন বলে'। অথচ তাঁর বেতনবৃদ্ধির বিশেষ দরকার ছিল। কেননা, তাঁর স্ত্রী ক্রমান্বয়ে নূতন ছেলের মুখ দেখতেন। বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে বেতনবৃদ্ধির যে কোনই যোগাযোগ নেই, এই মোটা কথাটা প্রাণবন্ধুর মনে আর কিছুতেই বস্‌ল না। ফলে তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেল যে, আপিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা গুণের আদর মোটেই করেন না। সুতরাং তাঁর পক্ষে, কি কথায়, কি কাজে, কর্ত্তৃপক্ষদের মন যুগিয়ে চলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শেষটা দাঁড়াল এই যে, প্রাণবন্ধু যা-খুসি তাই করত, যা-খুসি তাই বল্‌ত,—কারো কোনো পরোয়া রাখত না। কর্ত্তৃপক্ষেরাও তার কথায় কাণ দিতেন না; কেননা, তাঁরা ধরে' নিয়েছিলেন যে, প্রাণবন্ধু হচ্ছে ষ্টেটের একজন পেন্‌সানভোগী।

(৬)

এই নূতন ম্যানেজারের হাতে পড়ে' প্রাণবন্ধু পড়ল মুস্কিলে। সে ভদ্রলোক বেলা এগারটায় আপিসে আর কিছুতেই এসে জুটতে পারলে না। ফলে তাঁকে নিয়ে হুজুর পড়লেন আরও বেশী মুস্কিলে। নিত্য

তার মাইনে কাটা গেলে বেচারা যায় মারা—আর না কাটলেও তাঁর নিয়ম যায় মারা। এই উভয়-সঙ্কটে তিনি তাকে কর্ম্ম হ'তে অবসর দেওয়াই স্থির করলেন। এই মনস্থ করে' তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইলেন, তারপর তার জবাবদিহি শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন। প্রাণবন্ধু তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে বল্‌লে—"হুজুর, আট্‌টার আগে ঘুমই ভাঙে না। তারপর চা আর তামাক খেতেই ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তারপর নাওয়া-খাওয়া করে' এক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে কি আর এগারটার মধ্যে আপিসে পৌছান যায়?"

এ জবাব শুনে হুজুর যে অবাক্ হয়ে রইলেন, তার কারণ তাঁর নিজেরও অভ্যোস ছিল ঐ সাড়ে আটটায় ঘুম থেকে ওঠা। তারপর চা-চুরুট খেতে তাঁরও সাড়ে নয়টা বেজে যেত। সুতরাং পায়ে হেঁটে আপিসে আসতে হ'লে তিনি যে সেখানে এগারটার ভিতর পৌছতে পারতেন না, এ কথা তিনি মুখে স্বীকার না কর্‌লেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেই অবধি প্রাণবন্ধুর দেরী করে' আপিসে আসাটা চাটুয্যে সাহেব আর দেখেও দেখতেন না। ম্যানেজারের উপর প্রাণবন্ধুর এই হলো প্রথম জিৎ।

দু'দিন না যেতেই চাটুয্যে সাহেব আবিষ্কার কর্‌লেন যে, প্রাণবন্ধুকে ডেকে কখনও তন্মুহূর্ত্তে পাওয়া যায় না। যখনই ডাকেন, তখনই শোনেন যে, প্রাণবন্ধু তামাক সাজছে। শেষটা বিরক্ত হয়ে একদিন তাকে ধমক দেবামাত্র প্রাণবন্ধু কাতরস্বরে বল্‌লে—"হুজুর, আমি গরীব মানুষ, তাই আমাকে তামাক খেতে হয়, আর তা' নিজেই সেজে খেতে হয়। পয়সা থাকলে সিগারেট খেতুম, তাহ'লে আমাকে কাজ থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উঠতে হ'ত না। বাঁ হাতে অষ্ট প্রহর সিগারেট ধরে' ডান হাতে কলম চালাতুম।"

এবারও হুজুরকে চুপ করে' থাকতে হ'ল; কেননা, হুজুর নিজে অষ্টপ্রহর সিগারেট ফুঁকতেন তার আর এক দণ্ডও কামাই ছিল না। তিনি মনে ভাবলেন, প্রাণবন্ধু যা-খুসি তাই করুক গে, তাকে আর তিনি ঘাঁটাবেন না।

কিন্তু প্রাণবন্ধুকে আবার তিনি ঘাঁটাতে বাধ্য হলেন। একখানি জরুরি দলিল, যা এক দিনেই লিখে শেষ করা উচিত ছিল, সেখানা প্রাণবন্ধু যখন দু'দিনেও শেষ করতে পারলে না, তখন তিনি দেওয়ানজীর প্রতি এই দোষারোপ করলেন যে, তিনি আমলাদের দিয়ে কাজ তুলে নিতে পারেন না। দেওয়ানজী উত্তর করলেন যে, তিনি সকলের কাছে কাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু পারেন না এক প্রাণবন্ধুর কাছ থেকে। যেহেতু প্রাণবন্ধু আপিসে এসে আপিসের কাজ না করে' নিত্য ঘণ্টাখানেক ধরে' আর কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখে।

প্রাণবন্ধুর তলব হ'ল এবং কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ল। হুজুরের উপর দু-দু-বার জিত হওয়ায় তার সাহস বেজায় বেড়ে গিয়েছিল। সে ম্যানেজার সাহেবের মুখের উপর এই জবাব করলে,—"হুজুর, আমার লেখার একটু হাত আছে, তাই লিখে লিখে হাত পাকাবার চেষ্টা করি।"

—"তোমার হাতের লেখা যথেষ্ট পাকা, তা' আর বেশী পাকাবার দরকার নেই। আর যদি আরও পাকাতে হয় ত আপিসের লেখা লিখলেই হয় বাজে লেখা কেন?"

—"হুজুর, হাতের লেখার কথা বলছি নে। আমার প্রাণে একটু কাব্যরস আছে, তাই প্রকাশ করবার জন্য লিখি। আর সে লেখা বাজে নয়। গরীব মানুষের না হ'লে সে লেখা সব পুস্তক আকারে প্রকাশিত হ'ত। আমাকে তাই ঘরের লোকের পড়ার জন্যই লিখতে হয়। যদি

আমার পয়সা থাকত, তাহ'লে ত ছাইপাঁশ লিখে দেশের মাসিকপত্র ভরিয়ে দিতে পারতুম।"

এই উত্তরে চাটুয্যে-সাহেবের আঁতে ঘা লাগল। তিনি যে আপিসে বসে' মাসিক পত্রিকার জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেকরকম বেনামী প্রবন্ধ লিখতেন আর সে লেখাকে সমালোচকেরা ছাইপাঁশ বল্‌ত. এ কথা আর যার কাছেই থাক, তাঁর কাছে ত আর অবিদিত ছিল না তিনি আর ধৈর্য্য ধরে' থাক্‌তে পারলেন না, চক্ষু রক্তবর্ণ করে' বলে' উঠলেন—"দেখো, তোমার হওয়া উচিত ছিল—" তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রাণবন্ধু ব'লে' ফেল্‌ল—"বড়মানুষের জামাই! কিন্তু অদৃষ্ট ত আর সবারই সমান নয়।"

রোষে ক্ষোভে হুজুরের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। তিনি তাকে তর্জ্জনী দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন, প্রাণবন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল—আর এক ছিলিম ভাল ক'রে তামাক সাজতে। প্রাণবন্ধুর কিন্তু হুজুরকে অপমান করবার কোনই অভিপ্রায় ছিল না। সে শুধু নিজে সাফাই হবার জন্য ও-সব কথা বলেছিল। হিসেব করে' কথা কওয়ার অভ্যাস তার কস্মিন্‌কালেও ছিল না, আর পঁয়তাল্লিস বৎসর বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব!

(৭)

চাটুয্যে সাহেব দেওয়ানজীকে ডেকে বল্‌লেন—"প্রাণবন্ধুকে দিয়ে আর চলবে না, তার জায়গায় নূতন লোক বাহাল করা হোক। নূতন লোক খুঁজে বার করবার জন্যে দেওয়ানজী সাত দিনের সময় নিলেন। এর ভিতর তাঁর একটু গূঢ় মতলব ছিল। তিনি জানতেন, প্রাণবন্ধুর দ্বারা কস্মিন্‌-কালেও কাজ চলে নি, অতএব যে চাকরী তার এতদিন বজায় ছিল, আজ

তা' যাবার এমন কোনো নূতন কার' ঘটেনি। তা' ছাড়া তিনি জানতেন যে হুজুরের রাগ হপ্তা না পেরতেই চলে যাবে আর প্রাণবন্ধু সেরেস্তার যে কাজ চিরকলে করে এসেছে, ভবিষ্যতেও তাই করবে—অর্থাৎ তামাক সাজা। ফলে প্রায় হয়েছিলও তাই। যেমন দিন যেতে লাগল, তাঁর রাগও পড়ে আসতে লাগল, তারপর সপ্তম দিনের সকালবেলা চাটুয্যে-সাহেব রাগের কণাটকুও মনের কোনো কোণে খুঁজে পেলেন না। তিনি তাই ঠিক করলেন যে, এবারকার জন্য প্রাণবন্ধুকে মাপ করবেন। তার পর তিনি যখন ধড়া-চূড়ো পরে আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন "দেখ ত, এ চিঠির অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।" সে চিঠি এই—

"প্রিয়ে প্রিয়তরে প্রিয়তমে,

আজ তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারব না, কেননা আর একখানি মস্ত চিঠি লিখতে হয়েছে। জানই ত আমাদের ছোকরা হুজুর আমাকে নেক-নজরে দেখেন না, কেননা আমি চোর নই, অতএব খোসামুদেও নই। বরাবর দেখে আসছি যে, পৃথিবীতে গুণের আদর কেউ করে না, সবই খোসামোদের বশ। কিন্তু আমাদের এই নূতন ম্যানেজারের তুল্য খোসামোদ-প্রিয় লোক আমি ত আর কখনো দেখিনি। একমাত্র খোসামোদের জোরে যত বেটা চোর তাঁর প্রিয়পাত্র হয়েছে। যাদের হাতে তিনি পাকাকলা হয়েছেন, তাদের মুখে হুজুরের সুখ্যাতি আর ধরে না। অমন রূপ, অমন বুদ্ধি, অমন বিদ্যে, অমন মেজাজ একাধারে আর কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। এ সব শুনে তিনিও মহাখুসি। প্রিয়-পাত্রেরা কাগজ সুমুখে ধরলেই অমনি তাতে চোখ বুজে সই মেরে বসেন। এঁর হাতে ষ্টেটটা আর কিছু দিন থাকলে নির্ঘাত গোল্লায় যাবে।

জমিদারীর ম্যানেজারি করার অর্থ ইনি বোঝেন, গম্ভীর হয়ে কাঠের চৌকিতে কাঠের পুতুলের মত খাড়া হয়ে এগারটা-পাঁচটা ঠায় বসে' থাকা। ইনি ভাবেন, ওতে তাঁকে রাশভারি দেখায়, কিন্তু আসলে কি রকম দেখায় জান ?—ঠিক একটি সাক্ষিগোপালের মত। ইনি আপিসে ঢুকেই একটি কড়া হুকুম প্রচার করেছেন যে, কর্ম্মচারীদের সব এগারটায় হাজির হ'তে হবে আর পাঁচটায় ছুটি। আমি অবশ্য এ হুকুম মানিনে। কেননা, যারা কাজের হিসেব জানেনা, তারাই ঘণ্টার হিসেব করে সেই পুরুতদের মত যারা মন্ত্র পড়তে জানে না, কিন্তু ঘণ্টা নাড়তে জানে। খোসামুদেরা বলে 'হুজুরের কাজের কায়দা একদম সাহেবি'। ইনি এতেই খুসি, কেননা এঁর মগজে সে বুদ্ধি নেই, যা থাকলে বুঝতেন যে লেফাফা-দুরস্ত হ'লে যদি কাজের লোক হওয়া যেত, তাহ'লে পোষাক পরলেও সাহেব হওয়া যেত। এঁর বিশ্বাস ইনি সাহেব, কিন্তু আসলে কি জান ?—মেম-সাহেব। অন্ততঃ দূর থেকে দেখলে ত তাই মনে হয়। কেন জানো? —এঁর পুরুষের চেহারাই নয়। এঁর রংটা ফ্যাকাসে—সাবান মেখে, আর মুখে দাড়ি-গোঁফের লেশমাত্র নেই, কিন্তু আছে একমাথা চুল, তাও আবার কটা। সে যাই হোক, একটু বিপদে পড়ে' এই মেম-সাহেবের মেমসাহেবকে একখানি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আজ দুদিন থেকে কানাঘুষোয় শুনছি যে, হুজুর নাকি আমাকে বরখাস্ত করবেন। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, আমার মত গুণী লোকের চাকরীর ভাবনা নেই। তবে কি না, অনেক দিন আছি বলে' জায়গাটার উপর মায়া পড়ে' গেছে। মুনিবকে কিছু বলা বৃথা, কেননা, তিনি মুখ থাকতেও বোবা, চোখ থাকতেও কাণা। তাই তাঁকে কিছু না বলে' যিনি এই মুনিবের মুনিব, তাঁর অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর কাছে একখানি দরখাস্ত করেছি। শুনতে পাই আমাদের সাহেব মেমসাহেবের কথায় ওঠেন বসেন। এ

কথায় বিশ্বাস হয়, কারণ এঁর স্ত্রী শুনেছি ভারি সুন্দরী—প্রায় তোমার মত। তারপর এই অপদার্থটা তার স্ত্রীর ভাগ্যেই খায়, শুধু ভাত নয়, মদও খায়, চুরুটও খায়। ইনি বিস্তের মধ্যে শিখেছেন ঐ দুটি। সে যাই হোক, এঁর গৃহিণীকে যে চিঠিখানি লিখেছি, সে একটা পড়বার মত জিনিস। আমার দুঃখ রইল এই যে, সেখানি তোমার কাছে পাঠাতে পারলুম না। তার ভিতর সমান অংশে বীররস আর করুণরস পুরে দিয়েছি, আর তার ভাষা একদম সীতার বনবাসের। শুনতে পাই, কর্ত্রীঠাকুরাণী খুব ভাল লেখাপড়া জানেন। আমার এই চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারবেন যে, তাঁর স্বামী ও তোমার স্বামী, এ দুজনের মধ্যে কে বেশী গুণী। আশা করছি, কাল তোমাকে দশ টাকা মাইনে বাড়ার সুখবর দিতে পারব।

তোমারই প্রাণবন্ধু দাস।"

চাটুয্যে সাহেব চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে ঈষৎ কাষ্ঠহাসি হেসে স্ত্রীকে বললেন—"এ চিঠি তোমার নয়, ভুল খামে পোরা হয়েছে।"

বলা বাহুল্য, পত্রপাঠমাত্র প্রাণবন্ধুর বরখাস্তের হুকুম বেরল। চাটুয্যে সাহেব সব বরদাস্ত কর্‌রে পারেন, একমাত্র স্ত্রীর কাছে অপদস্থ হওয়া ছাড়া। কেননা, তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি পত্নী-গতপ্রাণ।

এই চিঠিই হ'ল প্রাণবন্ধু দাসের স্ত্রীর যথার্থ অদৃষ্ট-লিপি, আর সে লিপি সংশোধনের কোনোরূপ উপায় ছিল না, কেননা তা ছাপার অক্ষরে লেখা।

সম্পাদক ও বন্ধু

(গল্প)

—দেখো সুরনাথ, তোমার কাগজের এ সংখ্যাটি তেমন সুবিধে হয় নি।

—কেন বল দেখি ?

—নিজেই ভেবে দেখো, তা'হ'লেই বুঝতে পার্‌বে। যখন সম্পাদকী ক'র্‌ছ, তখন কোন্ লেখাটা ভাল, আর কোন্‌টা ভাল নয় তা' নিশ্চয় বুঝতে পারো।

— অবশ্য লেখা বেছে নিতে না জান্‌লে, সম্পাদকী করি কোন্ সাহসে ? এ সংখ্যায় কি আছে বল্‌ছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের "কালিদাস, মুণ্ড না জটিল", পি, সি, রায়ের "খদ্দর-রসায়ণ", বিনয় সরকারের "নয়া টঙ্কা", সুনীতি চাটুয্যের "হারাপ্পার ভাষাতত্ত্ব", রাখাল বাঁড়ুয্যের "বঙ্গদেশের প্রাক্-ভৌগোলিক ইতিহাস", বীরবলের "অন্নচিন্তা", শরৎ চাটুয্যের "বেদের মেয়ে", প্রমথ চৌধুরীর "উত্তর দক্ষিণ", ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "সঙ্গীতের X-Ray," অতুলচন্দ্র গুপ্তের "ইস্‌লামের রসপিপাসা" ;—এ-সব লেখার কোনটিরই কি মূল্য নেই !

—আমি ও সব দর্শন-বিজ্ঞান, হিষ্ট্রি-জিওগ্রাফী, ধর্ম্ম ও আর্ট প্রভৃতি বিষয়ের পণ্ডিতি প্রবন্ধের কথা বল্‌ছি নে। আর "বেদের মেয়ের" সঙ্গে ত আমি ভালবাসায় পড়ে' গিয়েছি। আর বীরবলের "অন্ন-চিন্তা" পড়ে আমার চোখে জল এসেছিল।

— তবে কোন্‌টিতে তোমার আপত্তি ?

—এবার কাগজে যে কবিতাটি বেরিয়েছে. সেটি কি ?

—"পিয়া ও পাপিয়ার"কথা ব'লছ ? ও কবিতার ত্রিপদী কি চতুষ্পদী হয়ে গিয়েছে ? ওতে কবিতার মাল-মসলা কি নেই ?

—সবই আছে, নেই শুধু মস্তিষ্ক।

—মস্তিষ্ক না থাক্, হৃদয় ত আছে ?

—হৃদয়ের মানে যদি হয় "ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো" তা' হ'লে অবশ্য ও ছাইয়ের সে আধার আছে ! ও-কবিতার পিয়া-পাপিয়ার কথোপকথন কার সাধ্য বোঝে। বিশেষতঃ যখন ওর ভিতর পিয়াও নেই, পাপিয়াও নেই।

—ও-ছুটির কোনটির থাক্‌বার ত কোনও কথা নেই। কবির আজও বিয়ে হয়নি—তা তা'র প্রিয়া আস্‌বে কোথ্‌থেকে ? আর ছেলেটি অতি সচ্চরিত্র—তাই কোনও অবিবাহিতা পিয়া তার কল্পনার ভিতরই নেই। আর সে জ্ঞান হয়ে অবধি বাস ক'রছে হ্যারিসন্ রোডে, দিবারাত্র শুনে আস্‌ছে শুধু ট্রামের ঘড়ঘড়ানি,—পাপিয়ার ডাক সে জন্মে শোনেনি। ও-পাড়ার কৃষ্ণদাস পালের ও দ্বারবঙ্গের মহারাজার প্রস্তরমূর্ত্তি ত আর পাপিয়ার তান ছাড়ে না।

—দেখো, এ-সব রসিকতা ছেড়ে দাও। যেমন কবিতার নাম তেম্‌নি কবির নাম। উক্ত মূর্ত্তিযুগলও এ-ছুটি নাম একসঙ্গে শুন্‌লে হেসে উঠ্‌ত, যদিচ হাস্যরসিক ব'লে তাদের কোনও খ্যাতি নেই।

—কবির নাম ত অতুলানন্দ। এ-নাম শুনে তোমার এত হাসি পাচ্ছে কেন ?

—এই ভেবে যে ও-রকম কবিতা সেই লিখ্‌তে পারে, যার অন্তরে আনন্দ অতুল। যার অন্তরে আনন্দের একটা মাত্রা আছে, সে আর ছাপার অক্ষরে ও-ভাবে পিউ পিউ ক'রতে পারে না।—

—ও নামে তোমার আপত্তি ত শুধু ঐ 'অ' উপসর্গে।

—হাঁ তাই।

—দেখো ছোক্‌রার বয়েস এখন আঠারো বছর।—যখন ওর অন্নপ্রাশন হয়, নন্‌-কোঅপারেশনের বহু পূর্ব্বে, তখন যদি ওর বাপ-মা ঐ উপসর্গটি ছেঁটে দিয়ে ওর নাম রাখ্‌তেন "তুলানন্দ"—তা হ'লে দেশেশুদ্ধ লোকও হেসে উঠ্‌ত। এমন কি, যমুনালাল বাজাজও হাসি সম্বরণ করতে পার্‌তেন না।

—তোমার এ-কথা আমি মানি। কিন্তু আমি জান্‌তে চাই, এ-কবিতা তুমি ছাপ্‌লে কেন? তুমি ত জান, ও-রচনা সেই জাতের, যা' না লিখলে কারও কোন ক্ষতি ছিল না।

—অতুলানন্দ যে রবীন্দ্রনাথ নয়, সে জ্ঞান আমার আছে। সুতরাং ও-কবিতাটি না ছাপলে কোনও ক্ষতি ছিল না।

—তবে একপাতা কালি নষ্ট ক'রলে কেন? কবিতার মত ছাপার কালি ত সস্তা নয়।

—কেন ছেপেছি, তা' সত্যি বল্‌ব?

—সত্যি কথা ব'ল্‌তে ভয় পাচ্ছ কেন?

—পাছে সে-কথা শুনে তুমি হেসে ওঠ।

—কথা যদি হাস্যকর হয়, অবশ্য হাস্‌ব।

—ব্যাপারটা এক হিসেবে হাস্যকর।

—অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? ব্যাপার কি?

—অতুলের কবিতা না ছাপলে তা'র মা দুঃখিত হবে বলে'।

—আমি ত জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদয় পরীক্ষকেরা যে ছেলে গোল্লা পেয়েছে, বাপ-মা'র খাতিরে তা'র কাগজে শূন্যের আগে একটা ৯ বসিয়ে দেন। সাহিত্যেও কি মার্ক দেবার সেই পদ্ধতি?

—না। সেইজন্যেই ত বল্‌তে ইতস্ততঃ ক'র্‌ছি।

—এ ব্যাপারের ভিতর গোপনীয় কিছু আছে নাকি?

—কিছুই না; তবে যা' নিত্য ঘটে না, সে ঘটনাকে মানুষে সহজভাবে নিতে পারে না। এই কারণেই সামাজিক লোকে এমন অনেক জিনিসের সাক্ষাৎ নিজের ও অপরের মনের ভিতর পায়, যে জিনিসের নাম তা'রা মুখে আন্‌তে চায় না, পাছে লোকে তা' শুনে হাসে। আমরা কেউ চাইনে যে, আর পাঁচজনে আমাদের মন্দ লোক মনে করুক, আর সেই সঙ্গে আমরা এও চাইনে যে, আর পাঁচজনে আমাদের অদ্ভুত লোক মনে করুক। প্রত্যেকে যে সকলের মত, আমরা সকলে তাই প্রমাণ ক'রতেই ব্যস্ত।

—যা নিত্য ঘটে না, আর ঘট্‌লেও সকলের চোখে পড়ে না, সেই ঘটনার নামই ত অপূর্ব্ব, অদ্ভুত ইত্যাদি। অপূর্ব্ব মানে মিথ্যে নয়, কিন্তু সেই সত্য যা' আমাদের পূর্ব্বজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খায় না। ফলে আমরা প্রথমেই মনে করি যে, তা' ঘটে নি, কেননা, তা' ঘটা উচিত হয় নি। আমাদের ঔচিত্যজ্ঞানই আমাদের সত্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। ধরো, তুমি যদি বলো যে, তুমি ভূত দেখেছ, তা'হ'লে আমি তোমার কথা অবিশ্বাস ক'র্‌ব, আর যদি তা' না করি ত মনে ক'র্‌ব, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

—তা' ত ঠিক। যে যা বলে, তাই বিশ্বাস কর্‌বার জন্য নিজের উপর অগাধ অবিশ্বাস চাই। আর নিজেকে পরের কথার খেলার পুতুল মনে ক'র্‌তে পারে শুধু জড়-পদার্থ, অবশ্য জড়-পদার্থের যদি মন ব'লে কোনও জিনিস থাকে।

—তুমি যে-রকম ভণিতা কর্‌ছ, তার থেকে আন্দাজ কর্‌ছি, "পিয়া ও পাপিয়ার" আবির্ভাবের পিছনে একটা মস্ত romance আছে।

—Romance এক বিন্দুও নেই। যদি থাকৃত ইতস্ততঃ ক'রব কেন? নিজেকে romanceএর নায়ক মনে কর্‌তে কার না ভাল লাগে? বিশেষতঃ তা'র, য'ার প্রকৃতিতে romanticism-এর লেশমাত্রও নেই। ও-প্রকৃতির লোক যখন একটা romantic গল্প গ'ড়ে তোলে, তখন অসংখ্য লোক তা' প'ড়ে মুগ্ধ হয়—কারণ, বেশির ভাগ লোকের গায়ে romanticism-এর গন্ধ পর্য্যন্ত নেই। মানুষের জীবনে যা' নেই, কল্পনায় সে তাই পেতে চায়। আর তা'র সেই ক্ষিধের খোরাক জোগায় রোমান্টিক সাহিত্য। যে-গল্পের ভিতর মনের আগুন নেই চোখের জল নেই, বাসনার ঊনপঞ্চাশ বায়ু নেই. আর যার অন্তে খুন নেই, জখম নেই, আত্মহত্যা নেই, তা কি কখনো রোমান্টিক্ হয়? "পিয়া ও পাপিয়ার" পিছনে যা' আছে সে হচ্ছে psychology-র একটি ঈষৎ বাঁকা রেখা। আর সে বাঁক্ এত সামান্য, যে সকলের তা' চোখে পড়ে না, বিশেষতঃ ও-রেখার গায়ে যখন কোনও ডগ্‌ডগে রঙ নেই। এই জন্যই ত ব্যাপারটি তোমাকে ব'ল্‌তে আমার সঙ্কোচ হ'চ্ছে। এ-ব্যাপারের ভিতর যদি কোনও নারীর হরণ কিম্বা বরণ থাক্‌ত, তা' হ'লেত সে বীরত্বের কাহিনী তোমাকে স্ফূর্ত্তি ক'রে ব'ল্‌তুম।

—তোমার মুখ থেকে যে কখনো রোমান্টিক্ গল্প বেরবে, বিশেষতঃ তোমার নিজের সম্বন্ধে, এ-দুরাশা কখনো করিনি। তোমাকে ত কলেজের ফার্ষ্ট্ ইয়ার থেকে জানি। তুমি যে সেন্টিমেন্টের কতটা ধার ধারো, তা ত আমার জান্‌তে বাকী নেই। তুমি মুখ খুল্‌লেই যে মনের চুল চিরতে আরম্ভ ক'রবে, এতদিনে কি তাও বুঝিনি? মানুষের মন জিনিসটিকে তুমি এক জিনিস ব'লে কখনই মানো নি। তোমার বিশ্বাস, ও-এক হচ্ছে বহুর সমষ্টি। তোমার ধারণা যে, মনের ঐক্য মানে তার গড়নের ঐক্য। মনের ভিতরকার সব রেখা মিলে তা'কে একটা ধরবার

ছোঁবার মত আকার দিয়েছে! আর এ-সব রেখাই সরল রেখা। তুমিও যে মানসিক বঙ্কিম রেখাৎ সাক্ষার পেয়েছ, এ অবশ্য তোমার পক্ষে একটা নতুন আবিষ্কার। এ-আবিষ্কারকাহিনী শোনবার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে, অবশ্য সে কৌতূহল scientific কৌতূহল মনে ক'রো না ;—তোমার মনের গোপন কথা শোন্‌বার জন্য আমি উৎসুক।

—ব্যাপারটা তোমাকে সংক্ষেপে ব'ল্‌ছি। শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে যে, এর ভিতর আমার নিজের মনের কোনো কথাই নেই—সরলও নয়, কুটিলও নয়। এখন শোন।

ব্যাপারটা অতি সামান্য। আমি যখন কলেজ থেকে M. A. পাস ক'রে বেরই, তখন অতুলের মা'র সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। প্রস্তাবটি অবশ্য কন্যাপক্ষ থেকেই এসেছিল। আমার আত্মীয়রা তা'তে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁদের আপত্তির কোনও কারণ ছিল না, কেন না, ও-পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বহুকাল থেকে চেনা-শোনা ছিল। ও-পক্ষের কুলশীলের কোনও খুঁত ছিল না, উপরন্তু মেয়েটি দেখ্‌তে পরমা সুন্দরী না হ'লেও সচরাচর বাঙালী মেয়ে যেরকম হয়ে থাকে, তার চেয়ে নিরেস নয় বরং সরেস, কারণ তার স্বাস্থ্য ছিল. যা সকলের থাকে না। আমার গুরুজনরা এ-প্রস্তাবে আমার মতের অপেক্ষা না রেখেই তাঁ'দের মত দিয়েছিলেন। তাঁরা যে আমার মত জানতে চাননি তা'র একটি কারণ—তাঁরা জানতেন যে, মেয়েটি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। "ওর চেয়ে ভাল মেয়ে পাবে কোথায়?"—এই ছিল তাঁদের মুখের ও মনের কথা। আমার মত জান্‌তে চাইলে তাঁরা একটু মুস্কিলে পড়্‌তেন। কারণ, আমি তখন কোন বিয়ের প্রস্তাবে সহজে রাজী হ'তুম না সুতরাং ও-প্রস্তাবেও নয়। ছুড়কো মেয়ে যেমন স্বামী দেখ্‌লেই পালাই-পালাই করে, আমার মন সেকালে তেমনি স্ত্রী-নামক জীবকে কল্পনার চোখে

দেখ্‌লেও পালাই-পালাই ক'রত। তা' ছাড়া সেকালে আমার বিবাহ করা আর জেলে যাওয়া দুই এক মনে হ'ত। ও-কথা মনে ক'র্‌তেও আমি ভয় পেতুম। তুমি মনে ভাবছ যে, আমার এ-কথা শুধু কথার কথা; একটা সাহিত্যিক খেয়াল মাত্র। আমি যে ঠিক আর পাঁচজনের মত নই, তাই প্রমাণ করবার জন্য এ-সব মনের কথা বানিয়ে ব'ল্‌ছি; সাহিত্যিকদের পূর্ব্বস্মৃতির মত এ পূর্ব্বস্মৃতিও কল্পনা-প্রসূত। কেননা, আমিও গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরেই গৃহস্থ হ'য়েছি। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে যে, মানুষের মৃত্যুভয় আছে ব'লে মানুষে মৃত্যু এড়াতে পারে না,—পারে শুধু কষ্টে-সৃষ্টে মৃত্যুর দিন একটু পিছিয়ে দিতে। আর মজা এই যে, যার মৃত্যুভয় অতিরিক্ত, সে যে ও-ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যা করে, এর প্রমাণও দুর্ল্লভ নয়। অজানা জিনিসের ভয় জান্‌লে দেখা যায় ভুয়ো।

সে যাই হোক্, এ বিয়ে ভেঙ্গে গেল। আমিও বাঁচলুম। কেন ভেঙ্গে গেল, শুন্‌বে? মেয়ের আত্মীয়রা খোঁজ-খবর ক'রে জানতে পেলেন যে, আমি নিঃস্ব—অর্থাৎ আমাদের পরিবারের বার'চটক্ দেখে লোকে যে মনে করে যে, সে-চটক রূপোর জলুস, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। কথাটা ঠিক। আমার বাপ-খুড়োরা কেউ পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ধনের উত্তরাধিকারের প্রসাদে বাবুগিরি করেন নি, আর তাঁরা বাবুগিরি ক'রতেন ব'লেই ছেলেদের জন্যও ধন সঞ্চয় ক'র্‌তে পারেন নি। আমাদের ছিল যত্র আয় তত্র ব্যয়ের পরিবার। কন্যাপক্ষের মতে এরকম পরিবারে মেয়ে দেওয়া আর তা'কে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া দুই সমান।

আমাদের আর্থিক অবস্থার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লতিকার আত্মীয়-স্বজন আমার চরিত্রের নানারকম ত্রুটিরও আবিষ্কার ক'র্‌লেন। আমি নাকি গানবাজনার মজ্‌লিসে আড্ডা দিই, গাইয়ে বাজিয়ে প্রভৃতি চরিত্র-

হীন লোকদের সহবত করি ; পান খাই, তামাক খাই, নস্যি নিই, এমন কি, Blue Ribbon Society-র নাম-লেখানো মেম্বর নই। এক কথায় আমি চরিত্রহীন।

আমার নামে লতিকার পরিবার এই সব অপবাদ রটাচ্ছে শুনে আমার গুরুজনেরাও মহা চটে গেলেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে ভালমন্দ বল্‌বার অধিকার শুধু তাঁদেরই আছে, অপর কারও নেই ; বিশেষতঃ আমার ভাবী শ্বশুরকুলের ত মোটেই নেই। ছোটকাকা ওদের স্পষ্টই বললেন যে, "শ্যাম্পেন ত আর গরুর জন্য তৈরী হয় নি, হয়েছে মানুষের জন্য, আর আমাদের ছেলেরা সব মানুষ, গরু নয়"। ভাঙা প্রস্তাব জোড়া লাগ্‌বার যদি কোনও সম্ভাবনা থাকৃত ত ছোটকাকার এক উক্তিতেই তা চুরমার হয়ে গেল। আমি আগেই ব'লেছি যে, এ বিয়ে ভাঙাতে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সেই সঙ্গে সব পক্ষই মনে করলেন যে, আপদ শান্তি। তবে শুনতে পেলুম যে, একমাত্র লতিকাই এতে প্রসন্ন হয় নি। কোন মেয়েই তার মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে নিলে খুসী হয় না। উপরন্তু আমার নিন্দাবাদটা তার কাণে মোটেই সত্যি কথার মত শোনায় নি। যখন বিয়ের প্রস্তাব এগচ্ছিল, তখন বাড়ীতে আমার অনেক গুণগান সে শুনেছে। দুদিন আগে যে দেবতা ছিল, দুদিন পরে সে কি ক'রে অপদেবতা হ'ল,তা' সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না। কারণ, তখন তা'র বয়েস মাত্র ষোলো—আর সংসারের কোনও অভিজ্ঞতা তা'র ছিল না। আমার সঙ্গে বিয়ে হ'ল না ব'লে সে দুঃখিত হয় নি, কিন্তু আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে মনে ক'রে সে বিরক্ত হয়েছিল।

লতিকার আত্মীয়েরা আমার চরিত্রহীনতার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি সচ্চরিত্র যুবককে আবিষ্কার করলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে

ভাঙবার এক মাস পরেই সরোজরঞ্জনের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হয়ে গেল। এতে আমি মহা খুসী হলুম। সরোজকে আমি অনেক দিন থাকতে জানতুম। আমার চাইতে সে ছিল সব বিষয়েই বেশি সৎপাত্র। সে ছিল অতি বলিষ্ঠ, অতি সুপুরুষ, আর এগজামিনে সে বরাবর আমার উপরেই হ'ত। সরোজের মত ভদ্র আর ভাল ছেলে আমাদের দলের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। উপরন্তু তার বাপ রেখে গিয়েছিলেন যথেষ্ট পয়সা। আমার যদি কোন ভগ্নী থাকত, তা'হ'লে সরোজকে আমার ভগ্নীপতি করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতুম। বিধাতা তা'কে আদর্শ জামাই ক'রে গড়েছিলেন।

আমি যা' মনে ভেবেছিলুম, হ'লোও তাই। সরোজ তা'র স্ত্রীকে অতি সুখে রেখেছিল। আদর-যত্ন অন্নবস্ত্রের অভাব লতিকা একদিনের জন্যও বোধ করেনি। এক কথায় আদর্শ স্বামীর শরীরে যে-সব গুণ থাকা দরকার, সরোজের শরীরে সে-সবই ছিল। দাম্পত্যজীবন যতদূর মসৃণ ও যতদূর নিষ্কণ্টক হ'তে পারে, এ-দম্পতির তা' হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবাহের দশ বৎসর পরেই লতিকা বিধবা হ'ল। সরোজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সরকারী চাকরী করত। অল্পদিনের মধ্যেই চাকরীতে সে খুব উন্নতি করেছিল। ইংরেজী সে নিখুঁতভাবে লিখতে পারত, তার হাতের ইংরেজীর ভিতর একটিও বানান ভুল থাকত না, একটিও আর্ষ প্রয়োগ থাকত না। এক হিসেবে তার ইংরেজী কলমই ছিল তার উন্নতির মূল। যদি সে বেঁচে থাকত, তা' হ'লে এতদিনে সে বড় কর্ত্তাদের দলে ঢুকে যেত। বুদ্ধিবিদ্যার সঙ্গে যা'র দেহে অসাধারণ পরিশ্রম-শক্তি থাকে, সে যা'তে হাত দেবে, তা'তেই কৃতকার্য্য হ'তে বাধ্য। লতিকা একটি আট বছরের ছেলে নিয়ে দেশে ফিরে এল।

এর পর থেকেই তার অন্তরে যত স্নেহ ছিল, সব গিয়ে প'ড়ল তার

ঐ একমাত্র সন্তানের উপর। ঐ ছেলে হ'ল তার ধ্যান ও জ্ঞান। ঐ ছেলেটীকে মানুষ ক'রে তোলাই হ'ল তার জীবনের ব্রত।

এ পর্য্যন্ত যা' বল্‌লুম, তার ভিতর কিছুই নূতনত্ব নেই। এ দেশে এবং আমার বিশ্বাস অপর দেশেও, বহু মায়ের ও-অবস্থায় একই মনোভাব হয়ে থাকে। তবে লতিকা তার ছেলেকে শুধু মানুষ করে তুল্‌তে চায় না, চায় অতিমানুষ কর্‌তে। আর এ অতি-মানুষের আদর্শ কে জানো? শ্রীসুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে আমি! এ কথা শুনে হেসো না। সে তার ছেলেকে পান-তামাক খেতে শেখাতে চায় না, সেই শিক্ষা দিতে চায়—যা'তে সে আমার মত সাহিত্যিক হয়ে উঠ্‌তে পারে। লতিকাকে তার স্বামী কিছু লেখা-পড়া শিখিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে তাকে বুঝিয়েছিল যে, "সুরনাথ যা লিখেছে, তার চাইতে সে যা লেখেনি, তার মূল্য ঢের বেশী,"। অর্থাৎ আমি যদি আল্‌সে না হতুম ত দশ ভল্যুম হিষ্ট্রি লিখতে পারতুম, আর না হয় ত পাঁচ ভল্যুম দর্শন। আমার ভিতর নাকি যে শক্তি ছিল, তার আমি সদ্ব্যবহার করিনি। এই কারণে সে মনে করে, আমিই হচ্ছি ওস্তাদ সাহিত্যিক। ফলে তার ছেলের সাহিত্যিক শিক্ষার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। আর এই ছেলেটির নাম অতুলানন্দ। আমি জানি সে কখনো সাহিত্যিক হবে না, অন্ততঃ আমার জাতের বাজে সাহিত্যিক হবে না। কারণ ছেলেটি হচ্ছে হুবহু সরোজের দ্বিতীয় সংস্করণ। সেই নাক, সেই চোখ, সেই মন, সেই প্রাণ! এ ছোক্‌রা কর্ম্মক্ষেত্রে বড় লোক হ'তে পারে, কিন্তু কাব্য-জগতে এর বিশেষ কোন স্থান নেই। সরোজের মত এরও মন বাঁধা ও সোজা পথ ছাড়া গলি-ঘুঁজিতে চল্‌তে চায় না। এর চরিত্রে ও মনে বেতালা বলে' কোনও জিনিস নেই। আমার ভয় হয় এই যে, এর মনের ছন্দকে আমি শেষটা মুক্ত-ছন্দ না ক'রে দিই। কারণ, তাহ'লে অতুল আর

সে-মুক্তির তাল সাম্‌লাতে পার্‌বে না। হাঁটা এক কথা আর বাঁশবাজী করা আলাদা। কিন্তু অতুলকে এক ধাক্কায় সাহিত্য-জগত থেকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ তা কর্‌তে গেলে লতিকার মস্ত একটা Illusion ভেঙে দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরেও অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমার স্ত্রী হচ্ছেন লতিকার বাল্য-বন্ধু ও প্রিয়সখী। অতুলকে সরস্বতী ছেড়ে লক্ষ্মীর সেবা কর্‌তে বল্‌লে আমাকে দু'বেলা এই কথা শুন্‌তে হবে যে—পরের জন্যে কিছু করা আমার ধাতে নেই। তাই নানাদিক ভেবেচিন্তে আমি তাকে কবিতা রচনায় লাগিয়ে দিলুম। জানতুম ও বাঁধা ছন্দে, বাঁধি গতে যাহয় একটা কিছু খাড়া ক'রে তুল্‌বে। এই হচ্ছে "পিয়া ও পাপিয়ার" জন্ম-কথা। এ-কবিতা ছাপার অক্ষরে ওঠবার ফলে লতিকা ওকে পাঁচ-শ' টাকা দিয়ে এক সেট সেক্‌সপিয়ার কিনে দিয়েছে। মনে ভেবো না যে অতুলের মায়ের খাতিরে আমি তার মাথা খাচ্ছি। ও-ছেলের মাথা কেউ খেতে পার্‌বে না। অতুলের ভিতর কবিত্ব না থাক, মনুষ্যত্ব আছে, আর সে মনুষ্যত্বের পরিচয় ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেবে। ও যখন জীবনে নিজের পথ খুঁজে পাবে, তখন কবিতা লেখবার বাজে সখ ওর মিটে যাবে। আর তখনও যদি ওর কলম চালাবার ঝোঁক থাকে ত আমি যা লিখিনি, কেননা লিখতে পারি নি,—ও তাই লিখবে; অর্থাৎ হয় দশ ভল্যুম ইতিহাস, নয় পাঁচ ভল্যুম দর্শন। পদ্য লেখার মেহন্নতে ওর গদ্যের হাত তৈরী হবে।

ওর অন্তরে যে কবিত্ব নেই, তার কারণ ওর বাপের অন্তরে তা ছিল না, ওর মা'র অন্তরেও তা নেই—অবশ্য কবিত্ব মানে যদি sentimentalism হয়।

এখন যে-কথা থেকে সুরু করেছিলুম, সেই কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

আমার প্রতি লতিকার এই অদ্ভুত শ্রদ্ধার মূলে কি আছে? এ মনোভাবের রূপই বা কি, নামই বা কি? একে ঠিক ভক্তিও বলা যায় না, প্রীতিও বলা যায় না। সুতরাং এ হচ্ছে ভক্তি ও প্রীতিরূপ মনের দুটি সুপরিচিত মনোভাবের মাঝামাঝি Psychology-র একটি বাঁকা রেখা।

আর এ যদি ভক্তিমূলক প্রীতি অথবা প্রীতিমূলক ভক্তি হয়, তাহ'লেও সে ভক্তি-প্রীতি কোনও রক্তমাংসে গড়া ব্যক্তির প্রতি নয়, অর্থাৎ ও-মনোভাব আমার প্রতি নয়, কিন্তু লতিকার মগ্ন-চৈতন্যে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে যে কাল্পনিক সুরনাথ বন্দোপাধ্যায় গড়ে উঠেছে, তারই প্রতি— অর্থাৎ একটা ছায়ার প্রতি, যে ছায়ার এ পৃথিবীতে কোন কায়া নেই। আমি শুধু তার উপলক্ষ্য মাত্র। আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে, তার মনে আমার প্রতি এই অমূলক ভক্তির মূলে আছে আমার প্রতি তার আত্মীয়স্বজনের সেকালের সেই অযথা অভক্তি। এ হচ্ছে সেই অপবাদের প্রতিবাদ মাত্র। এ প্রতিবাদ তা'র মনে তার অজ্ঞাতসারে আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। দেখছ এর ভিতর কোনও রোমান্স নেই, কেননা, এর ভিতর যা আছে, সে মনোভাব অস্পষ্ট—অতুলের মধ্যস্থতাই একমাত্র স্পষ্ট জিনিষ।

—রোমান্স নেই সত্য, কিন্তু এই একই ব্যাপারের ভিতর ট্র্যাজেডি থাকতে পারে।

— কিরকম?

—আমি এইরকম আর একটি ব্যাপার, জানি, যা শেষটা ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছিল। আজ থাক, সে গল্প আর একদিন বলব। কত ক্ষুদ্র ঘটনা মানুষের মনে যে কত বড় অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তা সে গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে।

———•———

গল্প লেখা

স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন

—গালে হাত দিয়ে ব'সে কি ভাবছ ?

—একটা গল্প লিখতে হবে, কিন্তু মাথায় কোনও গল্প আস্‌ছে না, তাই ব'সে ব'সে ভাবছি।

—এর জন্য আর এত ভাবনা কি ? গল্প মনে না আসে, লিখো না।

—গল্প লেখার অধিকার আমার আছে কি না জানিনে, কিন্তু না লেখবার অধিকার আমার নেই।

—কথাটা ঠিক বুঝলুম না।

—আমি লিখে খাই, তাই inspiration-এর জন্য অপেক্ষা করতে পারিনে। ক্ষিধে জিনিষটে নিত্য, আর inspiraton অনিত্য।

—লিখে যে কত খাও, তা আমি জানি। তা'হ'লে একটা পড়া-গল্প লিখে দেও না।

—লোকে যে সে চুরি ধর্‌তে পার্‌বে।

—ইংরেজী থেকে চুরি-করা গল্প বেমালুম চালানো যায়।

—যেমন ইংরেজকে ধুতি-চাদর পরালে তাকে বাঙ্গালী ব'লে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া যায়।

—দেখ, এ উপমা খাটে না। ইংরেজ ও বাঙ্গালীর বাইরের চেহারায় যেমন স্পষ্ট প্রভেদ আছে, মনের চেহারায় তেমন স্পষ্ট প্রভেদ নেই।

—অর্থাৎ ইংরেজও বাঙ্গালীর মত আগে জন্মায়, পরে মরে—আর জন্মমৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টা ছট্‌ফট্‌ করে।

—আর এই ছট্‌ফটানিকেই ত আমরা জীবন বলি।

—তা' ঠিক, কিন্তু এই জীবন জিনিষটিকে গল্পে পোরা যায় না— অন্ততঃ ছোট গল্পে ত নয়ই। জীবনের ছোট-বড় ঘটনা নিয়েই গল্প হয়। আর সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যা নিত্য ঘটে, এ দেশে তা' নিত্য ঘটে না।

—এইখানেই তোমার ভুল। যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না। ঘরে যা নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়?—যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।

—এই তোমার বিশ্বাস?

—এ বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাত দুপুরে একটা পড়ো-মন্দিরে আশ্রয় নিলুম—আর অমনি হাতে পেলুম একটি রমণী, আর সে যে-সে রমণী নয়—একেবারে তিলোত্তমা! এরকম ঘটনা বাঙ্গালীর জীবনে নিত্য ঘটেনা, তাই আমরা এ গল্প একবার পড়ি, দু'বার পড়ি, তিনবার পড়ি—আর পড়েই যাব যত দিন না কেউ এর চাইতেও বেশী অসম্ভব একটা গল্প লিখবে।

—তাহ'লে তোমার মতে গল্পমাত্রই রূপকথা?

—অবশ্য।

—ও-দু'য়ের ভিতর কোনও প্রভেদ নেই?

—একটা মস্ত প্রভেদ আছে। রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোল আনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব ব'লে মানি।

—তাহ'লে বলি, ইংরেজী গল্পের বাঙ্গলা করলে তা' হবে রূপকথা।

—অর্থাৎ বিলেতের লোক যা লেখে, তাই অলৌকিক!

—অসম্ভব ও অলৌকিক এক কথা নয়। যা' হ'তে পারে না কিন্তু হয়, তাই হচ্ছে অলৌকিক। আর যা হ'তে পারে না ব'লে হয় না, তাই হচ্ছে অসম্ভব।

—আমি ত বাঙ্গলা গল্পের একটা উদাহরণ দিয়েছি। তুমি এখন ইংরেজী গল্পের একটা উদাহরণ দাও।

- আচ্ছা দিচ্ছি। তুমি দিয়েছ একটি বড় গল্পের উদাহরণ; আমি দিচ্ছি একটি ছোট লেখকের ছোট গল্পের উদাহরণ।

—অর্থাৎ যাকে কেউ লেখক ব'লে স্বীকার করে না, তার লেখার নমুনা দেবে ?—একেই বলে প্রত্যুদাহরণ।

—ভালমন্দের প্রমাণ, জিনিসের ও মানুষের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। লোকে বলে, মাণিকের খানিকও ভাল।

—এই বিলেতী অজ্ঞাতকুলশীল লেখকের হাত থেকে মাণিক বেরয় ?

—মাছের পেট থেকেও যে হীরের আংটী বেরয়, এ কথা কালিদাস জান্‌তেন।

—এর উপর অবশ্য কথা নেই। এখন তোমার রত্ন বার কর।

—লণ্ডনে একটি যুবক ছিল, সে নেহাত গরীব। কোথাও চাকরী না পেয়ে সে গল্প লিখতে ব'সে গেল। তা'র inspiration এল হৃদয় থেকে নয়—পেট থেকে। যখন তা'র প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হ'ল, তখন সমস্ত সমালোচকরা বল্‌লে যে, এই নতুন লেখক আর কিছু না জানুক, স্ত্রী-চরিত্র জানে। সমালোচকদের মতে ভদ্রমহিলাদের সম্বন্ধে তা'র যে অন্তর্দৃষ্টি আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের বইয়ের সমালোচনার পর সমালোচনা প'ড়ে লেখকটিরও মনে এই ধারণা ব'সে গেল যে, তাঁর চোখে এমন ভগবদ্দত্ত X-rays আছে, যা র আলো

স্ত্রীজাতির অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত সোজা পৌঁছয়। তারপর তিনি নভেলের পর নভেলে স্ত্রী-হৃদয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর নাম হয়ে গেল যে, তিনি স্ত্রী-হৃদয়ের একজন অদ্বিতীয় expert, আর ঐ ধরণের সমালোচনা পড়তে পড়তে পাঠিকাদের বিশ্বাস জন্মে গেল যে. লেখক তাঁদের হৃদয়ের কথা সবই জানেন ; তাঁর দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গীর মধ্যেও তিনি রমণীর প্রচ্ছন্ন হৃদয় দেখতে পান। মেয়েরা যদি শোনে যে. কেউ হাত দেখতে জানে. তা'কে যেমন তারা হাত দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারে না—তেমনই বিলেতের সব বড় ঘরের মেয়েরা ঐ ভদ্রলোককে নিজেদের কেশেরও বেশের বিচিত্র রেখা ও রঙ সব দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। ফলে তিনি নিত্য ডিনারের নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর কস্মিন্‌কালেও কোনও কারবার ছিল না, হৃদয়ের দেনাপাওনার হিসেব তাঁর মনের খাতায় একদিনও অঙ্কপাত করে নি। তাই ভদ্রসমাজে তিনি মেয়েদের সঙ্গে দুটি কথাও কইতে পারতেন না, ভয়ে ও সঙ্কোচে তাদের কাছ থেকে দূরে স'রে থাক্‌তেন। ইংরেজ ভদ্রলোকরা ডিনারে ব'সে যত না খায়. তার চাইতে ঢের বেশী কথা কয়। কিন্তু আমাদের নভেলিষ্ট্‌টি কথা কইতেন না—শুধু নীরবে খেয়ে যেতেন। এর কারণ, তিনি ওরকম চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় জীবনে কখনও চোখেও দেখেন নি। এর জন্য তাঁর স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার খ্যাতি পাঠিকাদের কাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ল না। তারা ধ'রে নিলে যে, তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আছে বলেই বাহ্যজ্ঞান মোটেই নেই। আর তাঁর নীরবতার কারণ তাঁর দৃষ্টির একাগ্রতা। ক্রমে সমগ্র ইংরেজ-সমাজে তিনি একজন বড় লেখক ব'লে গণ্য হলেন ; কিন্তু তা'তেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি হ'তে চাইলেন এ যুগের সব চাইতে বড়, লেখক। তাই তিনি এমন

কয়েকখানি নভেল লেখবার সঙ্কল্প করলেন, যা সেক্সপিয়ারের নাটকের পাশে স্থান পাবে।

এ যুগে এমন বই লণ্ডনে ব'সে লেখা যায় না; কেন না, লণ্ডনের আকাশ-বাতাস কলের ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। তাই তিনি পাত্তাড়ি গুটিয়ে প্যারিসে গেলেন; কেননা, প্যারিসের আকাশ-বাতাস মনোজগতের ইলেকট্রিসিটিতে ভরপূর। এ যুগের য়ুরোপের সব বড় লেখক প্যারিসে বাস করে, আর তা'রা সকলেই স্বীকার ক'রে যে, তাদের যে-সব বই Nobel prize পেয়েছে, সে সব প্যারিসে লেখা। প্যারিসে কলম ধরলে ইংরেজের হাত থেকে চমৎকার ইংরেজী বেরয়, জার্ম্মাণের হাত থেকে সুবোধ জার্ম্মাণ, রাসিয়ানের হাত থেকে খাঁটি রাসিয়ান, ইত্যাদি।

প্যারিসের সমগ্র আকাশ অবশ্য এই মানসিক ইলেকট্রিসিটিতে পরিপূর্ণ নয়। মেঘ যেমন এখানে ওখানে থাকে, আর তার মাঝে মাঝে থাকে ফাঁক, প্যারিসেও তেমনই মনের আড্ডা এখানে-ওখানে ছড়ানো আছে। কিন্তু প্যারিসের হোটেলে গিয়ে বাস করার অর্থ মনোজগতের বাইরে থাকা।

তাই লেখকটি তাঁর masterpiece লেখবার জন্য প্যারিসের একটি আর্টিষ্টের আড্ডায় গিয়ে বাসা বাঁধলেন। সেখানে যত স্ত্রী-পুরুষ ছিল, সবই আর্টিষ্ট—অর্থাৎ সবারই ঝোঁক ছিল আর্টিষ্ট হবার দিকে।

এই হবু-আর্টিষ্টদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল স্ত্রীলোক। এরা জাতে ইংরেজ হলেও মনে হয়ে উঠেছিল ফরাসী।

এদের মধ্যে একটি তরুণীর প্রতি নভেলিষ্টের চোখ পড়ল। তিনি আর পাঁচজনের চাইতে বেশী সুন্দর ছিলেন না, কিন্তু তা'দের তুলনায় ছিলেন ঢের বেশী জীবন্ত। তিনি সবার চাইতে বকতেন বেশী, চলতেন

বেশী, হাসতেন বেশী। তা'র উপর তিনি স্ত্রী পুরুষনির্ব্বিচারে সকলের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করতেন, কোনরূপ রমণীসুলভ ন্যাকামি তাঁ'র স্বচ্ছন্দ ব্যবহারকে আড়ষ্ট করত না। পুরুষজাতির নয়ন-মন আকৃষ্ট করবার তাঁ'র কোনরূপ চেষ্টা ছিল না, ফলে তা'দের নয়ন-মন তাঁ'র প্রতি বেশী আকৃষ্ট হ'ত।

দু'চার দিনের মধ্যেই এই নবাগত লেখকটির তিনি যুগপৎ বন্ধু ও মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ালেন। লেখকটি যে ঘাগ্‌রা দেখলেই ভয়ে, সঙ্কোচে ও সম্ভ্রমে জড়সড় হয়ে পড়তেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং এদের ভিতর যে বন্ধুত্ব হ'ল, সে শুধু মেয়েটীর গুণে।

নভেলিষ্টের মনে এই বন্ধুত্ব বিনাবাক্যে ভালবাসায় পরিণত হ'ল। নভেলিষ্টের বুক এতদিন খালি ছিল, তাই প্রথম যে রমণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ল, তিনিই অবলীলাক্রমে তা' অধিকার করে' নিলেন। এ সত্য অবশ্য লেখকের কাছে অবিদিত থাক্‌ল না, মেয়েটির কাছেও নয়। লেখকটী মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্যে মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভরসা করে' সে কথা মুখে প্রকাশ করতে পারলেন না। এই স্ত্রী-হৃদয়ের বিশেষজ্ঞ এই স্ত্রীলোকটির হৃদয়ের কথা কিছুমাত্রও অনুমান করতে পারলেন না। শেষটা বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবার কাল ঘনিয়ে এল। মেয়েটি একদিন বিষণ্ণ ভাবে নভেলিষ্টকে বল্‌লে যে, সে দেশে ফিরে যাবে —টাকার অভাবে। আর ইংলণ্ডের এক মরা পাড়াগাঁয়ে তাকে গিয়ে schoolmistress হ'তে হ'বে—পেটের দায়ে। তা'র সকল উচ্চ আশার সমাধি হবে ঐ সৃষ্টিছাড়া স্কুল-ঘরে, আর সকল আর্টিষ্টিক শক্তি সার্থক হবে মুদিবাকালির মেয়েদের grammar শেখানতে। এ কথার অর্থ অবশ্য নভেলিষ্টের হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। দু'দিন পরেই মেয়েটি প্যারিসের ধূলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে হাসি-মুখে ইংলণ্ডে চলে' গেল। কিছুদিন পরে সে

ভদ্রলোক মেয়েটির কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন। ত'তে সে তার স্কুলের কারাকাহিনীর বর্ণনা এমন স্ফূর্ত্তি করে' লিখেছিল যে, সে চিঠি পড়ে' নভেলিষ্ট মনে মনে স্বীকার করলেন, মেয়েটি ইচ্ছে করলে খুব ভাল লেখক হ'তে পারে। নভেলিষ্ট সে পত্রের উত্তর খুব নভেলী ছাঁদে লিখলেন। কিন্তু যে কথা শোনবার প্রতীক্ষায় মেয়েটি বসে' ছিল, সে কথা আর লিখলেন না। এ উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর এল না। এদিকে প্রত্যুত্তরের আশায় বৃথা অপেক্ষা করে' করে' ভদ্রলোক প্রায় পাগল হয়ে উঠল। শেষটা একদিন সে মনস্থির করলে যে, যা' থাকে কুলকপালে, দেশে ফিরে গিয়েই ঐ মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব করবে। সেই দিনই সে প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে চলে' গেল। তা'র পরদিন সে মেয়েটি যেখানে থাকে, সেই গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গাড়ী থেকে নেমেই সে দেখলে যে, মেয়েটি পোষ্ট আপিসের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি বল্লে "তুমি এখানে ?"

"তোমাকে একটি কথা বল্তে এসেছি।"

"কি কথা ?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"সে ত অনেক দিন থেকেই জানি। আর কোনও কথা আছে ?"

"আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

"এ কথা আগে বল্লে না কেন ?"

"এ প্রশ্ন করছ কেন ?"

"আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

"কার সঙ্গে ?"

"এখানকার একটি উকীলের সঙ্গে।"

এ কথা শুনে নভেলিষ্ট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর মেয়েটি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল।

—বস্, গল্প ঐখানেই শেষ হ'ল ?

—অবশ্য ! এর পর ও-গল্প আর কি করে' টেনে বাড়ানো যেত ?

– অতি সহজে। লেখক ইচ্ছে করলেই বল্‌তে পারতেন যে, ভদ্রলোক প্রথমতঃ থতমত খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন, পরে ভেউ ভেউ করে' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে 'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং' বলে' চীৎকার করতে করতে মেয়েটির পিছনে ছুটতে লাগলেন, আর সেও খিল খিল করে' হাসতে হাসতে ছুটে পালাতে লাগল। রাস্তায় ভিড় জ'মে গেল। তারপর এসে জুটল সেই solicitor স্বামী, আর সঙ্গে এল পুলিস। তারপর যবনিকাপতন।

—তা হ'লে ও-ট্রাজেডি ত কমেডি হয়ে উঠ্‌ত।

—তা'তে ক্ষতি কি ? জীবনের যত ট্রাজেডি তোমাদের গল্পলেখকদের হাতে পড়ে' সবই ত comic হয়ে ওঠে। যে তা' বোঝে না, সেই তা' পড়ে' কাঁদে ; আর যে বোঝে, তা'র কান্না পায়।

—রসিকতা রাখো। এ ইংরেজী গল্প কি বাঙ্গলায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায় ?

—এরকম ঘটনা বাঙ্গালী-জীবনে অবশ্য ঘটে না।

—বিলেতী জীবনেই যে নিত্য ঘটে, তা নয়—তবে ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের জীবনে ?

—এ গল্পের আসল ঘটনা যা', তা' সব জাতের মধ্যেই ঘটতে পারে।

—আসল ঘটনাটি কি ?

—ভালবাসব, কিন্তু বিয়ে করব না, সাহসের অভাবে—এই হচ্ছে এ গল্পের মূল ট্রাজেডি।

—বিয়ে ও ভালবাসার এই ছাড়াছাড়ি এ দেশে কখনও দেখেছ? না শুনেছ?

—শোনবার কোনও প্রয়োজন নেই, দেখেছি দেদার।

—আমি কখনও দেখিনি, তাই তোমার মুখে শুন্‌তে চাই।

—তুমি গল্পলেখক হয়ে এ সত্য কখনও দেখনি, কল্পনার চোখেও নয়?

—না।

—তোমার দিব্যদৃষ্টি আছে।

—খুব সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু তোমার খোলা চোখে?

—এমন পুরুষ ঢের দেখেছি, যা'রা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু ভালবাসতে পারে না।

—আমি ভেবেছিলুম, তুমি বল্‌তে চাচ্ছ যে—

—তুমি কি ভেবেছিলে জানি। কিন্তু বিয়ে ও ভালবাসার অমিল এ দেশেও যে হয়, সে কথা ত এখন স্বীকার করছ?

—যাক্ ও সব কথা। ও-গল্প যে বাঙ্গলায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায় না, এ কথা ত মানো?

—মোটেই না। টাকা ভাঙ্গালে রূপো পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তামা। অর্থাৎ জিনিস একই থাকে, শুধু তার ধাতু বদলে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে তার রঙ। যে ধাতু আর রঙ বদ্‌লে নিতে জানে, তার হাতে ইংরেজী গল্প ঠিক বাঙ্গলা হবে। ভাল কথা, তোমার ইংরেজী গল্পটার নাম কি?

—The Man Who Understood Women.

—এ গল্পের নায়ক প্রতি বাঙ্গালী হ'তে পারবে। কারণ তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছ the man who understands women.

—এই ঘণ্টাখানেক ধ'রে বকর্ বকর্ ক'রে আমাকে একটা গল্প লিখতে দিলে না।

—আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেও, সেইটেই হবে—

—গল্প না প্রবন্ধ?

—একাধারে ও দুই-ই।

—আর তা' পড়বে কে, পড়ে খুসীই বা হবে কে?

—তা'রা, যা'রা জীবনের মর্ম্ম বই পড়ে শেখে না, দায়ে পড়ে শেখে

—অর্থাৎ মেয়েরা।

অগ্রহায়ণ ১৯৩২।

পূজার বলি

উকীল অবশ্য আমরা সবাই হই—পয়সা রোজগার করবার জন্য। কিন্তু পয়সা সকলের ভাগ্যে জোটে না। তবুও যে আমরা অনেকেই ও-ব্যবসার মায়া কাটাতে পারিনে, তার কারণ ও-ব্যবসার টান শুধু টাকার টান নয়। আমাদের ভিতর যাঁদের মন পলিটিক্সের উপর প'ড়ে আছে, তাঁরা জানেন যে, বার-লাইব্রেরীর তুল্য পলিটিক্সের স্কুল ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি ন ভূত ন ভবিষ্যতি। ও-স্কুলে ঢুকলে আমরা যে জুনিয়ার পলিটিক্সের হাড়হদ্দর সন্ধান পাই, শুধু তাই নয়; সেই সঙ্গে আমাদের পলিটিক্যাল মেজাজও নিত্য তর্ক-বিতর্ক বাগ্-বিতণ্ডার ফলে সপ্তমে চ'ড়ে থাকে। এ স্কুলের আর এক মহাগুণ এই যে, এখানে কোনও ছাত্র নেই, সবাই শিক্ষক—জায়গাটা হচ্ছে একালের ভাষায় যাকে বলে—পুরো ডিমোক্রাটিক। মিটিং ত এখানে নিত্য হয়, উপরন্তু freedom of speech এ ক্ষেত্রে অবাধ। তার পর যাঁদের মন পলিটিক্যাল নয়—সাহিত্যিক, তাঁরাও উকীলের বার-লাইব্রেরীতে ঢুকলেই দেখ্‌তে পাবেন যে, এতাদৃশ গল্পের আড্ডা দেশে অন্যত্র খুঁজে পাওয়া ভার। উকীল-মহলে একদিনে যে সব গল্প শোনা যায়, তাতে অন্ততঃ বারোখানা মাসিকপত্রের বারোমাস পেট ভরানো যায়।

পৃথিবীর মানুষের দুটিমাত্র ক্রিয়াশক্তি আছে;—এক বল, আর এক ছল। মানুষ যে কত অবস্থায় কত ভাবে কত প্রকার বল-প্রয়োগ করে, তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই সব উকীলের কাছ থেকে—যাঁরা ফৌজদারী আদালতে প্র্যাক্‌টিস্ করেন; আর non-violent লোকরা যে কত

অবস্থায়, কত ভাবে, কত প্রকার ছল-প্রয়োগ করেন, তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই সব উকীলের কাছ থেকে,—যাঁরা দেওয়ানী আদালতে প্র্যাক্‌টিস্ করেন।

আমি জনৈক ফৌজদারী উকীলের মুখে একটি গল্প শুনেছি, সেটি আপনারা শুন্‌লেও বল্‌বেন যে, হাঁ, এটি একটি গল্প বটে। আমার জনৈক উকীলবন্ধু উত্তরবঙ্গের কোনও জিলাকোর্টে একটি খুনী মামলায় আসামীকে defend করেন। কিন্তু তাকে তিনি খালাস কর্‌তে পারেন নি। জুরী আসামীকে একমত হয়ে দোষী সাব্যস্ত করেন, আর জজ-সাহেব তার উপর ফাঁসীর হুকুম দিলেন। হাইকোর্টে ফাঁসীর বদলে হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ।

আমার উকীল বন্ধুটির দেশে Criminal lawyer ব'লে খ্যাতি আছে। এর থেকেই অনুমান কর্‌তে পারেন যে, জীবনে তিনি বহু অপরাধীকে খালাস করেছেন আর বহু নিরপরাধকে জেলে পাঠিয়েছেন। খুনীমামলার আসামীর প্রাণরক্ষা না কর্‌তে পার্‌লে প্রায় সব উকীলই ঈষৎ কাতর হয়ে পড়েন; বোধহয় তাঁরা মনে করেন যে, বেচারার অপঘাতমৃত্যুর জন্য তাঁরাও কতক পরিমাণে দায়ী। এ ক্ষেত্রে আমার বন্ধু গলার জোরে আসামীর গলা বাঁচিয়েছিলেন, তবুও তা'র দ্বীপান্তরগমনে তাঁর পুত্রশোক উপস্থিত হয়েছিল। এই ঘটনার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি এ মামলার কথা উঠলেই রাগে, ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়্‌তেন, তখন তাঁর বড় বড় চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠত আর তার ভিতর থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ত। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আর জজসাহেব যদি টিফিনের পরে নয়, পূর্ব্বে জুরীকে ঘটনাটি বুঝিয়ে দিতেন, তাহ'লে জুরী একবাক্যে আসামীকে not guilty বল্‌ত। জজসাহেব নাকি টিফিনের সময় অতিরিক্ত

হুইস্কি পান করেছিলেন এবং তার ফলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সব ঘুলিয়ে ফেলেছিলেন।

মামলা হারলেই সে হারের জন্য উকীলমাত্রই জজের বিচারের দোষ ধরেন—যেমন পরীক্ষায় ফেল হ'লে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষকের দোষ ধরে। সেই জন্য আমি আমার বন্ধুর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখ্‌তে পারিনি। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আসামীর প্রতি অনুরাগই তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। কারণ, সে ছিল প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের ছেলে, তার পর জমীদারের ছেলে, তার উপর সুন্দর ছেলে, উপরন্তু কলেজের ভাল ছেলে! এরকম ছেলে যে কাউকে খুন-জখম করতে পারে, এ কথা আমার বন্ধু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি—তাই তিনি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

ঘটনাটি আমরা পাঁচজন একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। কারণ, সংসারের নিয়মই এই যে, পৃথিবীর পুরানো ঘটনা সব ঢাকা পড়ে নব নব ঘটনার জালে, আর আদালতে নিত্য নব ঘটনার কথা শোনা যায়। উক্ত ঘটনার বছর পাঁচেক পরে আমার বন্ধুটি এক দিন বার-লাইব্রেরীতে এসে আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বল্‌লেন যে, এখানি মন দিয়ে পড়ো, কিন্তু এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলো না। সে দিন আমার বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম না যে, তাঁর মনের ভিতর কি ভাব বিরাজ করছে—আনন্দ না মর্ম্মান্তিক দুঃখ? শুধু এইটুকু লক্ষ্য করলুম যে, একটা ভয়ের চেহারা তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। চিঠির দিকে তাকিয়ে প্রথমে নজরে পড়ল যে, তার উপরে কোনও ডাকঘরের ছাপ নেই। তাই মনে হয়েছিল যে, এখানি কোনও স্ত্রীলোকের চিঠি—যে চিঠি সে তাঁকে দেবার সুযোগ অথবা সাহস পায়নি। এরকম সন্দেহ হবার প্রধান কারণ এই যে, আমার বন্ধু আমাকে এ পত্রের বিষয়ে নীরব

থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তারপর যখন লক্ষ্য করলুম যে, শিরোনামা অতি সুন্দর, পরিষ্কার ও পাকা ইংরাজী অক্ষরে লেখা, তখন সে বিষয়ে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না। আমি লাইব্রেরীর একটি নিভৃত কোণে একখানি চেয়ারে ব'সে সেখানি এইভাবে পড়তে সুরু করলুম - যেন সেখানি কোনও brief-এর অংশ। ফলে কেউ আর আমার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে সেটি দেখবার চেষ্টা করলে না। উকীল-সমাজের একটা নীতি অথবা রীতি আছে, যা সকলেই মান্য করে। সকলেই পরব্রিফকে পরস্ত্রীর মত দেখে, অর্থাৎ কেহই প্রকাশ্যে তার দিকে নজর দেয় না।

সে চিঠিখানি নেহাৎ বড় নয়, তাই সেখানি এতদিন পরে প্রকাশ করছি। প'ড়ে দেখলেই ব্যাপার কি বুঝতে পারবেন।

"আন্দামান"।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দেশ থেকে যখন চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে আসি, তখন নানারকম দুঃখে আমার মন অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তার ভিতর একটি প্রধান দুঃখ ছিল এই যে, আসবার আগে আপনার পায়ের ধূলো নিয়ে আসতে পারিনি। আপনি আমার প্রাণরক্ষার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, তা' সত্য সত্যই অপূর্ব্ব। আমি জানতুম যে, উকীল-ব্যারিষ্টাররা মামলা লড়ে পয়সার জন্য, এবং তারা তাদের কর্ত্তব্যটুকু সমাধা করেই খালাস,—মামলার ফলাফল তাদের মনকে তেমন স্পর্শ করে না। এ ক্ষেত্রে পরিচয় পেলুম যে, মানুষ কেবলমাত্র তার কর্ত্তব্যটুকু সেরেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। অনেক মামলা উকীলদের মনকেও পেয়ে বসে। আপনি আমাকে খালাস করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, উপরন্তু আমার বিপদ আপনি নিজের বিপদ হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। আমার

সাজা হওয়ার ফলে আপনি যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ করেছিলেন, তা থেকে আমি বুঝলুম যে, আপনি আমার আপন ভাইয়ের মত আমার বিপদে ব্যথা বোধ করেছিলেন। এর ফলে আপনার স্মৃতি আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা রয়ে গিয়েছে।

আর একটি কথা, আসল ঘটনা কি ঘটেছিল, তা' আপনার কাছে আমরা গোপন করেছিলুম। আজকে সব কথা খুলে বল্‌ছি। সে কথা শুন্‌লেই বুঝতে পার্‌বেন যে, ঘটনা যা ঘটেছিল, তা নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও প্রকাশ কর্‌তে পার্‌তুম না। আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল যে, সুযোগ পেলেই আপনাকে এ ঘটনার সত্য ইতিহাস জানাব। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের এখানকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। তিনি দু'দিন পরে দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর হাতেই এ চিঠি পাঠাচ্ছি। তিনি এ চিঠি আপনার হাতে দেবেন।

আপনি জানেন যে, আমি যখন খুনী মামলার আসামী হই, তখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পড়তুম। শুধু পূজোর ছুটীতে বাড়ী আসি। আমি পঞ্চমীর দিন রাত আটটায় বাড়ী পৌঁছই। বাড়ী গিয়েই প্রথমে বাবার সঙ্গে দেখা করি, তারপর বাড়ীর ভিতর মা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলুম। বঙ্কুও আমার সঙ্গে মা'র কাছে গেল। বঙ্কু কে জানেন? সেই ছোকরাটি—যে আমার মামলার আগাগোড়া তদ্বির করছিল, আর যে দিবারাত্র আপনার কাছে থাকৃত, আপনাকে আমাদের defence বুঝিতে দিত। বঙ্কু আমার আত্মীয় নয়, —আমরা ব্রাহ্মণ আর সে ছিল কায়স্থ। কিন্তু এক হিসেবে সে আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের মতই ছিল। বঙ্কুর ঠাকুরদাদা আমার ঠাকুরদাদার দেওয়ান ছিলেন এবং তাঁর দত্ত জোতজমার প্রসাদে ওদের পরিবার গাঁয়ের একটি ভদ্র গেরস্ত পরিবার হয়ে উঠেছিল। ও পরিবার

আমাদের বিশেষ অনুগত ছিল। উপরন্তু বঙ্কু ছিল আমার সমবয়সী ও সহপাঠী। সে যখন ম্যাট্রিক পড়ত, তখন তার বাপ মারা যান। সে তাই স্কুল ছেড়ে দিয়ে সংসারের ভার ঘাড়ে নিলে। সেই অবধি সে গ্রামেই বাস করত এবং আমার বাবা ও মা যখন তার ঘাড়ে যে কাজের ভার চাপাতেন, তখন সে কাজ যেমন করেই হোক, সে উদ্ধার ক'রে দিত। এই সব কারণে সে যথার্থই ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আমাদের বাড়ীতে তার গতিবিধি ছিল অবাধ এবং তার সুমুখে সকলেই নির্ভয়ে সকল কথাই বল্‌তেন। বাড়ীর ভিতর গিয়ে শুনি যে, মা তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। বঙ্কু ও আমি তাঁর শোবার ঘরে ঢুকতেই তিনি বিছানায় উঠে বস্‌লেন। আমি তাঁকে প্রণাম করবার পর তিনি আমাকে ও বঙ্কুকে পাশের একখানি খাটে বসতে বললেন। আমরা বসবামাত্র মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ?

—ভাল।

—কলকাতায় কেমন ছিলে?

—ভালই ছিলুম।

—তবে কলকাতা ছেড়ে এখানে এলে কি জন্যে?

—পূজোর সময় বাড়ী আসব না?

—কার বাড়ীতে এসেছ?

—কেন, আমাদের বাড়ীতে।

—তোমাদের ত কোনও বাড়ী নেই।

—মা, তুমি কি বলছ, বুঝতে পাচ্ছিনে।

—এ বাড়ী অবশ্য তোমার চৌদ্দপুরুষের; কিন্তু তোমার নয়। অমন ক'রে চেয়ে রইলে কেন? জিজ্ঞাসা করি, জমিদারী কার, তোমাদের না অন্যের?

—আমাদের ব'লেই ত চিরকাল শুনে আসছি।

—তবে আমি বলি, শোন। তোমাদের এখন ফোঁটা দেবার মাটিটুকুও নেই।

—আগে ছিল, এখন গেল কি ক'রে?

—জমীদারী পাঁচ আনীর কাছে বন্ধক ছিল তা'ত জানো?

—হাঁ, জানি।

—এখন পাঁচ আনী দশ আনীরও মালিক হয়েছে। তোমাদের অংশ এখন পাঁচ আনীর কাছে আর বন্ধক নেই, এখন তা' দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছে, আর তা' কিনেছে পাঁচ আনী।

—বল কি? সত্যি?

—সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানিও গিয়েছে। পাঁচ আনী এখন তোমাদের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করেছে! যাক্, তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সে এবার পূজো করবে।

—তাহ'লে আমাদের পূজো বন্ধ থাক্‌বে?

—অবশ্য। এ অধিকার এখন পাঁচ আনীর, সে অধিকার সে ছাড়বে না। যে ঠাকুর আমরা এনেছি, সেই ঠাকুরই সে নিজের পুরুত দিয়ে পূজো করাবে, ধুমধামও হবে যথেষ্ট, আর আমাদের কাঙ্গালী বিদেয় করবে।

—এর কোনও উপায় নেই মা?

—থাক্‌বে না কেন, কিন্তু তোমাদের দ্বারা তা হবে না। আমার পেটে হয়েছে শুধু শেয়াল-কুকুর—যদি মানুষের গর্ভধারিণী হতুম, তাহ'লে আর তোমার চৌদ্দপুরুষের পূজো বন্ধ হ'ত না।

—উপায় কি?

—উপায় সোজা, শত্রুনিপাত করা।

মা'র মুখে এ প্রস্তাব শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হলো। তাঁর কথা শুনে আমি মাথা নীচু ক'রে বারবাড়ীতে চলে এলুম। বন্ধুও 'আস্‌ছি' ব'লে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, তাই আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবতে লাগলুম। মনটা এতই অস্থির হয়েছিল যে, তখন কি ভাবছিলুম তা বল্‌তে পারিনে। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক গেল। তারপর বন্ধু হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'ল। সে এসেই বল্লে যে, "চল, মা'র কাছে যাই, তাঁকে একটা খবর দিয়ে আসি।" বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলুম, তার এত গম্ভীর চেহারা আমি জীবনে কখনও দেখিনি; কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের ভিতর এমনই একটা দৃঢ় আদেশের সুর ছিল যে, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার সঙ্গে আবার বাড়ীর ভিতর গেলুম। মা তখনও নিজের ঘরে শুয়েছিলেন। বন্ধু তাঁর ঘরে ঢুকেই বল্‌লে, "মা, একটা সুখবর আছে, তোমার শত্রু নিপাত হয়েছে।" এ কথা শুনে মা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে হাঁ ক'রে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বন্ধু আবার বল্লে—"মা, কথা মিথ্যে নয়। আমিই তাকে নিজ হাতে নিপাত করেছি। বলি বাধে নি, এক কোপেই সাবাড় করেছি,"—এই ব'লেই সে বুকের ভিতর থেকে একখানা দা বার ক'রে দেখালে, সেখানি তাজা রক্তমাখা, এতই তাজা যে, তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

তাই দেখে মা মূর্চ্ছা গেলেন, আর আমি এক মুহূর্তের মধ্যে আলাদা মানুষ হয়ে গেলুম। আমার মনের ভিতর যেন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল। মনের পুরানো ভাব, পুরানো আশা-ভয় সব চুরমার হয়ে গেল। ভালমন্দর জ্ঞান মুহূর্তে লোপ পেল, আমার মনে হ'ল যেন আমি একটা মহাশ্মশানের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি, আর তখন মনে হ'ল, পৃথিবীতে মৃত্যুই সত্য, জীবনটা মিছে।

আসল ঘটনা যা ঘটেছিল, তা আপনাকে খুলেই লিখলুম। দেখছেন, এ ঘটনা আমি সেকালে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারতুম না, প্রাণ গেলেও নয়। আজ যে আপনার কাছে প্রকাশ করছি, তার কারণ, মা এখন ইহলোকে নেই, বন্ধু ত শুনেছি সংসার ত্যাগ করেছে।

আপনি ঠিকই ধরেছিলেন, খুন আমি করিনি। তবে আমি যে শাস্তি ভোগ করছি, তার কারণ, আসল ঘটনাটা প্রকাশ না পায়, তার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি এবং সত্য গোপন করতে হ'লে যে পরিমাণ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, তা নিতে কুণ্ঠিত হইনি। এ সব কথা আপনাকে না বললে আমার মনের একটা ভার নামত না, তাই আপনার কাছে অকপটে তা প্রকাশ করলুম—নিজের মনের সোয়াস্তির জন্য। আমি ভাল আছি অর্থাৎ এখানে এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে যতদূর স্বস্তিতে ও মনের আরামে থাকা সম্ভব, ততদূর আছি। ইতি

প্রণতঃ শ্রী—

এ চিঠি প'ড়ে আমিও অবাক হয়ে গেলুম। শুধু মনে হ'তে লাগল যে রাগের মুখের একটি কথা ও ঝোঁকের মাথায় একটি কাজ মানুষের জীবনে কি প্রলয় ঘটাতে পারে।

সহযাত্রী

১

সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় রেলের গাড়ীতে। ঘণ্টা তিনেক মাত্র তিনি আমার সহযাত্রী ছিলেন। কিন্তু এই তিন ঘণ্টা আমার জীবনে এমন অপূর্ব্ব তিন ঘণ্টা যে, তার স্মৃতি আমার মনে আজও জ্বল্-জ্বল্ করছে। এক এক সময়ে মনে হয় যে, সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আমার একটা কল্পনা মাত্র। আসলে তাঁর সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, কখনো কোনও কথাবার্ত্তা হয়নি। সমস্ত ব্যাপারটি এতই অদ্ভুত যে, সেটিকে সত্য ঘটনা ব'লে বিশ্বাস করবার পক্ষে আমার মনের ভিতরেই বাধা আছে। লোকে বলে, স্বপ্ন কখনো কখনো সত্য হয়, সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে সত্য আমার কাছে স্বপ্ন হ য়ে উঠেছে। এখন ঘটনা কি হয়েছিল. বল্ছি।

বছর পাঁচ ছয় আগে আমি একদিন রাত ১০টায় ঝাঝা থেকে একখানি জরুরী টেলিগ্রাম পাই যে, সেখানে আমার জনৈক আত্মীয়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, আর যদি আমি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাহ'লে সেই রাত্রেই আমার রওনা হওয়া প্রয়োজন। আমি আর তিলমাত্র বিলম্ব না ক'রে একখানি ঠিকা গাড়ীতে হাবড়ার দিকে ছুটলুম। সেখানে গিয়ে শুনলুম যে. মিনিট পাঁচেক পরেই একখানি গাড়ী ছাড়বে—যা'তে আমি ঝাঝা যেতে পারি। গাড়ীখানি অবশ্য Slow passenger এবং ছাড়ে অসময়ে, তবুও দেখি ট্রেণ একেবারে ভর্ত্তি,

কোথাও ভাল ক'রে বসবার স্থান নেই, শোবার স্থান ত দূরের কথা। খালি ছিল শুধু একটি ফার্ষ্ট ক্লাস compartment। তাই আমি একখানি ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনে সেই গাড়ীতেই চ'ড়ে বসলুম। প্রথমে সে গাড়ীতে আমি একাই ছিলুম, মধ্যে কোন্ ষ্টেশনে মনে নেই, একটি বৃদ্ধ ইংরাজ ভদ্রলোক আমার কামরায় এসে ঢুকলেন। তিনি এসেই আমার সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন। এ-কথা সে-কথা বলবার পর তিনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বৌবাজারের কসাই-কালী ভদ্রকালী না দক্ষিণাকালী। আমি বল্লুম "জানিনে।" তিনি একটি বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তানের মুখে এতাদৃশ অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। পরে বল্লেন যে, তিনি এ দেশে পূর্ব্বে engineer ছিলেন, এখন বিলেতে ব'সে তন্ত্রশাস্ত্র চর্চ্চা করছেন, মাত্র সম্প্রতি বাঙ্গলায় ফিরে এসেছেন, নানারূপ কালীমূর্ত্তি দর্শন করবার জন্য। তারপর সমস্ত রাত ধরে আমার কাছে কালীমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। সে রাত্তিরে মন আমার নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিল, সুতরাং তাঁর কথা আমার কানে ঢুকলেও মনে ঢোকেনি, নৈলে আমি কালীর বিষয়ে এমন একখানি treatise লিখতে পারতুম, যার প্রসাদে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে Doctor উপাধি পেতুম। আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য ক'রে তিনি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমি সব কথা খুলে বল্লুম। শুনে তিনি চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লেন—"তোমার আত্মীয় ভাল হয়ে গেছে।"

শেষ রাত্তিরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে চোখ খুলে দেখি, ট্রেণ আসানসোল ষ্টেশনে হাজির এবং আমার সাহেব সহযাত্রীটী অদৃশ্য হয়েছেন। কামরাটি খালি দেখে ভাবলুম যে, এই বৃদ্ধ ইংরাজ ভদ্রলোকের বিষয় আমি ত স্বপ্ন দেখিনি? রাত্তিরের ব্যাপার সত্য কি স্বপ্ন, তা ঠিক

বুঝতে না পেরে আমি গাড়ী থেকে নেমে Refreshment roomএ প্রবেশ করলুম,—এক পেয়ালা চায়ের সাহায্যে চোখ থেকে ঘুমের ঘোর ছাড়াবার জন্য।

২

মিনিট দশেক পরে গাড়ীতে ফিরে এসে দেখি, সেখানে দু'টি নূতন আরোহী ব'সে আছেন। একজন পল্টনি সাহেব, আর একজন সাধু। সাহেবটির চেহারা ও বেশভূষা দেখে বুঝলুম, তিনি হয় একজন Colonel নয় Major, আভিজাত্যের ছাপ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিল। আমি গাড়ীতে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্তে উঠে প'ড়ে আমার বসবার জন্য জায়গা ক'রে দিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বসে পড়লুম; কিন্তু আমার চোখ প'ড়ে রইল ঐ সাধুটীরই উপর। প্রথমেই নজরে পড়ল, তিনি একটী মহাপুরুষ না হলেও, একটি প্রকাণ্ড পুরুষ। তাঁর তুলনায় কর্ণেল সাহেবটি ছিলেন একটি ছোক্‌রা মাত্র। স্বামীজী যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, তাঁর বুকের বেড় অন্ততঃ ৪৮ ইঞ্চি হবে। অথচ তিনি স্থূল নন। এ শরীর যে কুস্তিগীর পালোয়ানের, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না। কুস্তিগির হ'লেও তাঁর চেহারাতে চোয়াড়ে ভাব ছিল না। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, অর্থাৎ তামাতে রূপোর খাদ দিলে এই উভয় ধাতু মিলে যে রঙের সৃষ্টি করে, সেই গোছের রঙ। তাঁর চোখের তারা দুটি ছিল ফিরোজার মত নীল ও নিরেট্। এ রকম নিষ্ঠুর চোখ আমি মানুষের মুখে ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। তাঁর গায়ে ছিল গেরুয়া রংয়ের রেশমের আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড গেরুয়া পাগড়ী ও পায়ে পেশোয়ারী চাপ্‌লি। তাঁকে দেখে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম, কারণ পাঠান যে সাধু হয়, তা আমি জানতুম না; আর আমি

ধ'রে নিয়েছিলুম যে, এ ব্যক্তি পাঠান না হ'য়ে যায় না। এঁর মুখে-চোখে একটা নির্ভীক বেপরোয়া ভাব ছিল - যা এ দেশের কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কারও মুখে সচরাচর দেখা যায় না।

আমি হাঁ ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি দেখে, স্বামীজী আমাকে বাঙ্গলায় বল্‌লেন—

"মশায় কি মনে কর্‌ছেন যে, আমি ভুল ক'রে এ গাড়ীতে উঠেছি,—থার্ড ক্লাস ভেবে ফার্ষ্ট ক্লাসে ঢুকেছি? অত' কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আমি নই,—এই দেখুন আমার টিকিট।"

কথাটা শুনে আমি একটু অপ্রস্তুতভাবে বল্‌লুম—"না, তা কেন মনে করব? আজকাল অনেক সাধু-সন্ন্যাসীই ত দেখতে পাই ফার্ষ্ট ক্লাসেই যাতায়াত করেন। এমন কি, কেউ কেউ একা একটি saloon অধিকার ক'রে ব'সে থাকেন।"

এর উত্তর হ'ল একটি অট্টহাস্য। তার পর তিনি বল্‌লেন—"সে মশায় পরের পয়সায়। আমার মশায় এমন ভক্ত নেই যাদের বিশ্বাস, আমাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলেই তারা স্বর্গে seat পাবে। গেরুয়া পর্‌লেই যে পরের কাছে হাত পাততে হবে, বিধির এমন কোনো বিধান নেই।"

—তা অবশ্য।

—কে কি কাপড় পরে, তার থেকে যদি কে কিরকম লোক, তা চেনা যেত, তাহ'লে ত আপনাকেও সাহেব ব'লে মান্‌তে হ'ত।

আমার পরণে ছিল ইংরাজী কাপড়, সুতরাং সন্ন্যাসী ঠাকুরের এ বিদ্রূপ আমাকে নীরবে সহ্য কর্‌তে হ'ল।

এর পরেই তিনি ধ্যানস্তিমিত-লোচনে আকাশের দিকে মুখ তুলে রইলেন। অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাক্‌বার পর, তিনি একদৃষ্টে কর্ণেল সাহেবকে নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ

পড়ল কর্ণেল সাহেবের কামান-প্রমাণ বন্দুকটির উপর। তিনি তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন—"May I have a look at your weapon, sir?"

কর্ণেল সাহেব উত্তর করলেন,—"Certainly, here it is!" এই ব'লে তিনি বন্দুকটা স্বামীজীর হাতে তুলে দিলেন। স্বামীজী "thank you" ব'লে সেটি করতলগত করলেন। তারপর সেটি নেড়ে চেড়ে বললেন—"It's a Winchester repeater."

—That's right.

—Splendid weapon—but no use for us shikaris.

—No, it's not a sporting gun.

—Would you care to have a look at my gun? I am sure you will like it.

এই ব'লে তিনি বেঞ্চের নীচে থেকে একটি বন্দুকের বাক্স টেনে নিয়ে, একটি রাইফেল বার ক'রে, "Let me take out the balls" ব'লে, তার ভিতর থেকে ছুটি টোটা নিষ্কাশিত ক'রে সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। সাহেব সে বন্দুকটি দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, এবং ছু-তিনবার মৃদুস্বরে বললেন—"It's a beauty!" তার পরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"Did you get it in Calcutta?"

—No, I brought it out from England.

—It must have cost you a pot of money.

—Two hundred and fifty pounds.

এর পর সাহেবে-স্বামীতে যে কথোপকথন হ'ল—তা আমার অবোধ্য। মনে আছে শুধু ছু-চারটি ইংরাজী কথা—যথা Twelve-bore, 465, Holland & Holland প্রভৃতি। আন্দাজ করলুম, এ সব হচ্ছে বন্দুক নামক বস্তুর নাম, ধাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি। তারপর সীতারামপুর

ষ্টেশনে সাহেব নেমে গেলেন এবং যাবার সময় স্বামীজীর করমর্দ্দন ক'রে বললেন, "Well, good-bye, glad to have met you"। স্বামীজীও উত্তর করলেন, "Au revoir."

আমি এতক্ষণ অবাক্ হয়ে স্বামীজীর কথাবার্ত্তা শুনলুম এবং তার থেকে এই সার সংগ্রহ করলুম যে, তিনি বাঙ্গালী, ইংরাজী-শিক্ষিত, ধনী ও শিকারী। এরকম লোকের সাক্ষাৎ জীবনে একবার ছাড়া দু'বার পথে-ঘাটে মেলে না।

এর পর স্বামীজী যে ব্যবহার করলেন, তা আমার আরও অদ্ভুত লাগল। সন্ন্যাসী হ'লেও দেখলুম, তিনি আসন-সিদ্ধ যোগী নন। এমন ছটফটে লোক এ বয়সের লোকের ভিতর দেখা যায় না। পাঁচ মিনিট অন্তর তিনি এখান থেকে উঠে ওখানে বসতে লাগলেন, বিড়-বিড় ক'রে কি বকতে লাগলেন এবং মধ্যে মধ্যে গাড়ীর ভিতরেই পায়চারী করতে লাগলেন। শুধু পাশ দিয়ে আর একখানি গাড়ী চ'লে গেলে তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পাশের গাড়ীর যাত্রীদের অতি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। আমরা তেড়ে চলেছি পশ্চিমমুখে, আর অপর গাড়ীগুলি তেড়ে চলেছে পূর্ব্বমুখে; পথমধ্যে উভয়ের মিলন হচ্ছে সেকেণ্ডখানিকের জন্য। এ অবস্থায় এক গাড়ীর লোক অপর গাড়ীর লোকদের কি লক্ষ্য করতে পারে, বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম এইমাত্র যে, নিজের গাড়ীর লোকের চাইতে অপর গাড়ীর লোক সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ঢের বেশি। কারণ, সীতারামপুরের পরে তিনি অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কওয়া দূরে থাক, আমার প্রতি দৃক্পাতও করেননি। তাঁর এ ব্যবহার দেখে আমি যে আশ্চর্য্য হয়েছি, তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ, তিনি হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "আপনি বোধহয় জানতে চান যে, আমি

পাশের চলন্ত ট্রেণে কি খুঁজছি? আচ্ছা, আমি সংক্ষেপে বলছি, মন দিয়ে শুনুন।"

আমার নাম সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা জমিদারী। আমার বাবার ছিল মস্ত জমিদারী; উত্তরাধিকারিস্বত্বে আমি এখন তার মালিক। বাবা যখন মারা যান, আমি তখন নেহাত নাবালক। কাজেই Court of Wards সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে, আর আমার শিক্ষক হলেন একজন ইংরাজ ভদ্রলোক। তিনি এককালে ছিলেন কাপ্তেন। আমি কখনো স্কুল-কলেজে পড়িনি। আমি যা-কিছু শিখেছি, সে সবই তাঁর কাছে। তিনি আমাকে কি শিখিয়েছেন জানেন?—ঘোড়ায় চড়তে, বন্দুক ছুঁড়তে, ইংরাজীতে কথা কইতে। এ তিন বিষয়ে বাঙ্গলার জমিদারের ছেলের মধ্যে আমি বোধহয়, বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার ইংরাজী কথাত আপনি শুনেছেন? আর আমি যে কিরকম সওয়ার, তা জানে বাঙ্গলার পয়লা নম্বরের ঘোড়ারা। আর আমি একটা গণ্ডারকে পঁচিশ ফিট দূর থেকে এক গুলিতে ধরাশায়ী করতে পারি। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ।—আমার দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন সংস্কৃতভাষা, ধর্ম্মকর্ম্ম, পূজাপাঠ, আর তন্ত্রমন্ত্র। জমিদারের ছেলের ধর্ম্মজ্ঞান থাকা নাকি নিতান্ত দরকার। তাই আমি একসঙ্গে ঘোর হিন্দু ও ঘোর সাহেব—একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়।

তবে এ বেশ কেন? আমি গেরুয়া পরেছি কাঞ্চনের অভাবে নয়, কামিনীর অভাবে। কথাটা শুনে বোধহয় আপনি ভাবছেন যে, বড়-মানুষের ছেলের আবার কামিনীর অভাব! আমি কিন্তু মশায় আর

পাঁচজনের মত নই। টাকা থাক্‌লেই বদ্‌খেয়ালী হ'তে হবে, এমন কোনো কথা নেই। জীবনে এক ফোঁটা মদও খাইনি, একটান তামাকও টানিনি, আর অদ্যাবধি নিজের স্ত্রী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিনি। আমি পর পর তিনটি বিবাহ করি, তিনটিই গত হয়েছে।

আমার প্রথম বিবাহ নাবালক অবস্থাতেই হয়, একটি সমান ঘরের মেয়ের সঙ্গে। সে স্ত্রীটি ছিল—যেমন বড় জমিদারের মেয়ে হয়ে থাকে। তার ছিল কুল, শীল, ভদ্রতা ; ছিল না শুধু রূপ আর বুদ্ধি। ছেলেবেলা থেকে দুধ খেয়ে খেয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি নীলগাই। কিন্তু সে গাই কখনো বিয়োয় নি, এই যা রক্ষে।

দ্বিতীয়টি আমি নিজে দেখে বিয়ে করি। গেরস্তের মেয়ে। সে ছিল যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী—যাকে কথায় বলে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। জমিদারীর কাজকর্ম্ম সব তার হাতে ছেড়ে দিয়ে, আমি শুধু শিকার করেই বেড়াতুম। অমন মেয়ে বোধহয় বাঙ্গলাদেশে লাখে একটি পাওয়া যায় না। রূপে তাকে অনেকে হয় ত টেক্কা দিতে পারে, কিন্তু গুণে নয়!

তার মৃত্যুর পর আমি আবার বিয়ে করি—স্ত্রীবিয়োগের এক মাসের মধ্যে। এই তৃতীয় পক্ষই আমাকে এ বেশ ধরিয়েছে। এর থেকে মনে ভাববেন না যে, সে দেব্যা হয়ে আমার সম্পত্তি ভোগদখল করছে, আর আমি রাস্তায় রাস্তায় 'এক সের আটা আওর আধা সের ঘিউ মিলা দে ভগবান' ব'লে সকাল-সন্ধ্যে চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছি। ছেলেবেলায় একটি গান শুনেছিলুম—

মরি হায় হায়, শুনে হাসি পায়,
কাল শশী যাবেন কাশী
ভস্মরাশি মেখে গায়।

শর্ম্মাও কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ ক'রে কাশী যাবার ছেলে নয়। আমার তৃতীয় পক্ষ দেশছাড়া হয়েছেন ব'লে আমিও দেশছাড়া হয়েছি। কথাটা একটু হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে, না?—ব্যাপার কি হয়েছে, আপনাকে বল্‌ছি। তা আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সে আপনার খুসী। I don't care a rap for other people's opinion.

আমাদের বাড়ীর ভিতরের বাগানে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে—মেয়েদের স্নানের জন্য। আমার তৃতীয়া স্ত্রী বিবাহের মাসকয়েক পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা সেখানে গা ধুতে যান ও সেই পুকুরে ডুবে মারা যান। আমি অবশ্য তখন বাড়ী ছিলুম না, আসামে খেদা করতে গিয়েছিলুম। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর আমার কাছে পৌছতে প্রায় সাত দিন লাগে, আর আমি বাড়ী ফিরে এসে দেখি যে, আমার স্ত্রী চ'লে গিয়েছেন—তবে লোকান্তরে কি দেশান্তরে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পার্‌লুম না। এ সন্দেহের কারণ বল্‌ছি।

সে ছিল নিতান্ত গরীবের মেয়ে, কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। স্বর্গের অপ্সরা ভুলে মর্ত্ত্যে এসে পড়েছিল। পয়সার অভাবে বাপ বহুকাল মেয়েটির বিয়ে দিতে পারেনি। আমি যখন এ বিবাহের প্রস্তাব করি, তখন তার বয়েস আঠারো। তার বাপ প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়নি শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। ঘুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ে রাজরাণী হবে, এতেও আপত্তি! এরকম মুখছোপ খাওয়া আমার বংশের অভ্যাস নেই। আমি সেই হতভাগা ব্রাহ্মণকে ব'লে পাঠালুম যে, যদি সে আর মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি না হয় ত মেয়েটিকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে আসব, আর তার ঘর দোর হাতী দিয়ে ভাঙ্গিয়ে জলে ফেলে দেব। তখন সে ভয়ে মেয়ে তুলে নিয়ে এসে আমার হাতে কন্যাসম্প্রদান করলে। দুদিন না যেতেই কানাঘুষোয় শুনলুম যে, এ বিবাহে বাপের কোনো

আপত্তি ছিল না—আপত্তি ছিল মেয়ের। আমারই এক ছোকরা আমলার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এবং তাকে ছাড়া আর কাউকেও বিবাহ করবে না, এই পণ সে ধ'রে বসেছিল। ছোকরাটি ছিল তার গাঁয়ের লোক, দেখতে সুপুরুষ, আর গাইতে বাজাতে ওস্তাদ। উপরন্তু তাকে সচ্চরিত্র ব'লে জানতুম। বলা বাহুল্য, এ গুজব শোনবামাত্র আমি ছোকরাটিকে আমার বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলুম। তার কিছুদিন পরেই আমার স্ত্রী জলে ডুবে মারা গেলেন। সুতরাং আমার মনে এ সন্দেহ রয়েই গেল যে, সে মরেনি,—পালিয়েছে। সে যে কি প্রকৃতির মেয়ে ছিল, তা আমি বলতে পারিনে, কারণ, বিবাহের পর তার সঙ্গে আমার ভাল ক'রে আলাপ-পরিচয় হয়নি। সে ছিল বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তাই তাকে ছুঁতে ভয় করতুম। বিদ্যুৎকে পোষ মানাবার বিদ্যে আমি জানতুম না। বহুমূল্য রত্ন বাক্সেই বন্ধ ছিল, হঠাৎ এক দিন অন্তর্দ্ধান হ'ল। এই ঘটনা ঘটবার পর থেকেই আমার মন একেবারে বিগড়ে গেল। ওঃ, কি রূপ তার! তবে তার বিয়োগে যত না হ'ল দুঃখ, তার চাইতে বেশি হ'ল রাগ। সে বোঝেনি যে, স্বর্গের অপ্সরাও মর্ত্ত্যে এসে কেউটের লেজে পা দিতে পারে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"সংসারে বীতরাগ হয়েই বুঝি আপনি কাষায়-বসন ধারণ করেছেন?"

তিনি উত্তর করলেন—

সংসারে বীতরাগ হয়েছি ব'লে আত্মহত্যা করবার ত কোন কারণ নেই। পৃথিবীতে দেদার বাঘ-ভালুক গুলি খাবার আশায় ব সে রয়েছে, তাদের বঞ্চিত ক'রে নিজে গুলি খেয়ে বসব কেন? তা ছাড়া, আমার তৃতীয় পক্ষ গত হবার পর ত আমি অনায়াসে চতুর্থ পক্ষ করতে পারতুম। আমার আত্মীয়স্বজন দেশময় আমার উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ করছিলেন;

আমি নিঃসন্তান, আমাদের বংশরক্ষা ত হওয়া চাই। কিন্তু এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল—যাতে ক'রে চতুর্থ পক্ষ আর এ যাত্রা করা হ'ল না।

আমি বাড়ী থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলুম। রাণাঘাট ষ্টেশনে একটি ট্রেণ দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের গাড়ী পাশে এসে লাগ্‌তেই সে গাড়ীখানি ছেড়ে দিলে। দেখি, সে গাড়ীর একটি থার্ড ক্লাসের কম্পার্টমেণ্টে আমার সেই গুণধর আমলাটি ব'সে আছে, আর পাশে একটি অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতী। সে যুবতীটি যে আমার তৃতীয়পক্ষ, তা বুঝতে আমার আর দেরী হ'ল না যদিও তার মুখটি ভাল ক'রে দেখতে পাইনি। তবে instinct বলে'ও ত একটা জিনিস আছে। সেই দিন থেকে আমি শুধু ট্রেণে ট্রেণে ঘুরে বেড়াই—একদিন না একদিন তাদের ধরবই, এ লুকোচুরি খেলার একদিন সাঙ্গ হবেই। গেরুয়া ধারণের উদ্দেশ্য—যাতে ক'রে তারা আমাকে চিনতে না পারে। আর সঙ্গে যে এই বন্দুক নিয়ে বেড়াই, তার কারণ জানেন? এবার যেদিন ও-দু'জনের সাক্ষাৎ পাব, সেদিন এর দুটি গুলি দুজনের বুকের ভিতর ব'সে যাবে। আমার স্ত্রী হরণ ক'রে নিয়ে যাবে, আর অক্ষতশরীরে হেসে-খেলে বেড়াবে, এমন লোক এ দুনিয়ায় আজও জন্মায় নি। তারপর—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমলয়ো নাম নগাধিরাজঃ—তার ক্রোড়ে আশ্রয় নেব।

এই কথা বল্‌তে না বল্‌তে ট্রেণ দেওঘর ষ্টেশনে এসে পৌছল। পাশ দিয়ে একখানি ট্রেণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল। সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্‌লেন, "এই যে, ট্রেণে তারা যাচ্ছে।" এই ব'লেই তিনি বন্দুক হাতে ক'রে তড়াক্ ক'রে প্লাটফরমে লাফিয়ে পড়লেন। তারপর বন্দুকের ঘোড়া দুটি টানলেন। দুবার শুধু ক্লিক্ ক্লিক্ আওয়াজ হ'ল। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তার ভিতর টোটা নেই। তখন তিনি

আল্‌খাল্লার বুকের পকেট থেকে দুটি টোটা বার ক'রে বন্দুকে পুরলেন,—ইতিমধ্যে সে ট্রেণখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের গাড়ীও ছেড়ে দিলে। সিতিকণ্ঠ বন্দুক হাতে দেওঘরের ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর সিতিকণ্ঠকে জীবনে আর কখনো দেখিনি, নিজের গাড়ীতেও নয়, পাশের গাড়ীতেও নয়। আমি শুধু ভাবি, সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর এখন কোথায়? হিমালয়ে না সাগরপারে, জেলে না পাগ্‌লা-গারদে?

ঝাঁপান খেলা

১

এ গল্প আমার একটি বন্ধুর মুখে শোনা।

বন্ধুবর আসলে ছিলেন মুন্সেফ, কিন্তু তাঁর হওয়া উচিত ছিল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রথমতঃ তাঁর ছিল পূরো হাকিমী মেজাজ; আর সেই কারণে তিনি পরতেন ইংরাজী পোষাক, খেতেন ইংরাজী খানা, ফুঁকতেন আধ হাত লম্বা বর্ম্মা চুরুট। উপরন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি লেখেন নির্ভুল ইংরাজী, আর বলেন ইংরাজের মুখের ইংরাজী। কিন্তু মুনসেফী আদালতে এই দুই বিদ্যের পরিচয় দেবার তেমন সুযোগ নেই — এই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান দুঃখ। রায় অবশ্য তাঁকে ইংরাজীতেই লিখতে হ'ত, কিন্তু বাকি খাজনার মামলার রায়ে তো আর Shakespeare, Milton কোট করা চলে না।

কাযেই তিনি বাধ্য হয়ে আমাদের পাঁচজনের কাছে সাহিত্য আলোচনাচ্ছলে তাঁর বিদ্যের দৌড় দেখাতেন। আমরা কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা শুনতে খুবই ভালবাসতুম। তিনি গল্প করতে যে পটু ছিলেন, শুধু তাই নয়, গল্প বলতেনও চমৎকার। চমৎকার বলছি এই জন্যে যে, সে সব গল্পের বিষয়ও নতুন, বলবার কায়দাও অকেতাবী। সে গল্পগুলি ইংরাজী সাহিত্য থেকে চোরাই মাল নয়। তিনি মুন্সেফ না হয়ে ডেপুটী হলে যে একজন ছোট-খাটো বঙ্কিম হতেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই— অবশ্য যদি তাঁর বাঙলা এমন পাঁচমিশেলী না হ'ত। বঙ্কিমের বই প'ড়ে

যেমন মনে হয় যে, বাঙলা ভাষা সংস্কৃত-বাপ-কি বেটা; - বন্ধুবরের কথা শুনে তেমনি বোঝা যেত যে, বাঙলা ছত্রিশ জাতের ভাষা। তার ভিতর মধ্যে মধ্যে এমন সব কথা থাকৃত—যাদের কোন অভিধানে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, এমন কি, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের সদ্যপ্রকাশিত "চলন্তিকা"তেও নয়। এ হেন পৈতা-ফেলা ভাষা ভদ্র সমাজে নিত্য শোনা যায় না।

২

বন্ধুবরের নাম করছিনে এই ভয়ে যে, পাছে তাঁর literary ক্ষমতা আছে জানলে তাঁর প্রোমোশন বন্ধ হয়। কে না জানে যে, সাহিত্যের মত বে-আইনি জিনিষ আর নেই। তা ছাড়া তিনি যখন লেখক নন, তখন তাঁর নামের কোনও মূল্য নেই। মুন্সেফ বাবু ও ডেপুটী বাবুদের নাম আর কে মনে ক'রে রাখে?

তিনি একদিন আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন যে, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত, আমার ছেলেবেলার একটা গল্প বলি।"

আমি বললুম, "আপনি আপনার ছেলেবেলার গল্প বলবেন, তাতে আমি ক্ষুণ্ন হব কেন?"

"তাতে একটা জিনিষ আছে, যা আপনার কাণে ভাল না লাগতে পারে। সে জিনিষটে হচ্ছে গল্পের নায়কের নাম। আর লেখকমাত্রেই নামের বিষয়ে বড় sensitive। আপনি মনে করতে পারেন যে, ও-নামটি আমি ইচ্ছে করেই রেখেছি—একটু রসিকতা করবার জন্য। কিন্তু আমার ওরকম কোনও কু-মতলব নেই। গল্প যারা বানিয়ে বলে, অর্থাৎ লেখকরা, তাদের অবশ্য নায়ক-নায়িকার নামকরণের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমার মত যারা সত্য ঘটনা বর্ণনা করে, তাদের যার যে নাম, তা বলা ছাড়া আর উপায় নেই।"

এ কথা শুনে আমি তাঁকে ভরসা দিলুম যে, "নায়কের নাম যাই হোক না কেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। একাধিক লেখকের এক নাম হলেই মুস্কিল, কেন না তাহলে পাঠকরা অন্যের লেখার জন্য আমাদের দায়ী করবে, অথবা আমাদের লেখার দায় অপরের ঘাড়ে চাপাবে। কিন্তু লেখক আর নায়ক ত এক চিজ নয়। সুতরাং আপনি নির্ভয়ে ব'লে যান। আপনার গল্পের নায়ক যদি গুণ্ডাও হয়, আর আমার যা নাম, তার নামও যদি তাই হয়, তাহলেও Goonda Act-য়ে আমি গ্রেপ্তার হব না। আমার মত নিরীহ লেখক বাঙলায় যে দ্বিতীয় নেই, তা কে না জানে?"

বন্ধুবর হেসে বললেন, "তবে বলি, শ্রবণ করুন।

৩

বাবার জীবনের প্রধান সখ ছিল শিকার। তাই তিনি বারোমাস বন্দুক, ঘোড়া ও কুকুর নিয়েই মত্ত থাকতেন। আমরাও তাই জন্মাবধি বারুদ, কুকুর ও ঘোড়ার গন্ধ শুঁকে শুঁকেই বড় হয়েছি। কুকুর যে চোখে দেখে নয়, গন্ধ শুঁকেই জানোয়ার চেনে, এ কথা ত আপনারা সবাই জানেন; কিন্তু নানা জাতীয় কুকুরের গায়ে যে নানারকমের রঙের মত নানারকমের গন্ধ আছে, তা বোধহয় আপনারা লক্ষ্য করেননি। ওদের আভিজাত্যের পরিচয় ওদের গন্ধেই পাওয়া যায়। ফুলেরও যেমন, কুকুরেরও তেমনি, রূপের সঙ্গে গন্ধের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে। যাক্ ও সব কথা।

আমার বয়স যখন ছয় ও সাতের মাঝামাঝি—বাবা একটি নীল-কুঠেল সাহেবের কাছ থেকে গুটিকয়েক শিকারী কুকুর কিনে নিয়ে এলেন। একটি Bull-dog, দুটি Greyhound, দুটি Fox আর একটি Bull-

terrier। Greyhound ছুটি বাঙলায় যাকে বলে "ডালকুত্তা"—দেখতে ঠিক হরিণের মত, সেই রঙ, সেই চোখ মাথায় শুধু শিং নেই, আর ছুট্‌তেও তদ্রূপ। Bull-dog-টির রূপের কথা আর ব'লে কায নেই। তার মুখ নাক ব'লে কোন জিনিষ ছিল না, চোখ ছুটি একদম গোল। তার মুখে থাকবার ভিতর ছিল শুধু ছুপাটি দাঁত। সে কাউকে কামড়াবা-মাত্র, তার চোয়াল আটকে যেত, আর তখন তার মুখের ভিতর লোহার শিক পুরে দিয়ে মক্ষম চাড় দিয়ে তবে মুখ খোলা যেত।

নীলকুঠেল সাহেবের কৃষ্ণপক্ষের মেম, কুঠীর হেড বরকন্দাজ উমেশ সর্দ্দারের মেয়ে টগর বিবি, তার দাম চড়াবার জন্য বাবাকে বলেছিল যে, "পেলাগ্‌ ধরবেক ত ছাড়বেক না"। "পেলাগ্‌" হচ্ছে অবশ্য ইংরাজী Pluck শব্দের বুনো অপভ্রংশ। এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ আমরা ছুদিন না যেতেই পেলুম। পাড়ার বাগ্দীদের একটা মস্ত কুকুর ছিল। সে আসলে দেশী হলেও বিলেতির বেনামিতে চ'লে যেত। যেমন দেশী খৃষ্টানেরও কখনও কখনও বিলেতি নাম থাকে, তেমনই তারও নাম ছিল Richard। সে যে পূরো বিলেতি না হোক্‌, উঁচুদরের দো-আঁসলা, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। রিচার্ড একদিন পেলাগের সঙ্গে দোস্তি করতে এসেছিল। ফলে পেলাগ্‌ না-বলা-কওয়া তার গায়ে এমনি দাঁত বসিয়ে দিলে যে, পাঁচজনে প'ড়ে যখন তার দাঁত ছাড়ালে, তখন দেখা গেল যে, রিচার্ডের হাড়গোড় সব থেঁতলে পিষে গিয়েছে। বাবাকে তার জন্য রিচার্ডের মালিককে ড্যামেজ দিতে হয়েছিল নগদ ১০৲ টাকা। এতে আমার ভারি রাগ হয়েছিল। কারণ, এ ক'টা টাকা পেলে আমরা মনের সুখে ঘুড়ি উড়িয়ে বাঁচতুম, আর আমার স্কুল-ফ্রেণ্ড ভজহরি কুণ্ডুর পরামর্শ মত ম'ার বাক্স থেকে এক টাকা চুরি করতে হ'ত না।

৪

বাবা এই সব শিকারী কুকুর নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, বাড়ী-সুদ্ধ লোককে, বিশেষতঃ মাকে বেজায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললেন। তাদের ঠিকমত নাওয়ানো হচ্ছে না, খাওয়ানো হচ্ছে না, ব'লে দিবারাত্র চাকরদের উপর বকাবকি সুরু করলেন। বামন ঠাকুর পেল্যাগের জন্য একদিন মোগলাই-দস্তুর কোর্ম্মা রেঁধেছিল, তাতে গরম মসলা ও নুনের কম্‌তি ছিল না, উপরন্তু ছিল পোয়াখানেক ঘি। বাবা শুনে মহাক্ষিপ্ত হ'য়ে মাকে গিয়ে বললেন যে, "বামন ঠাকুর দেখছি কুকুর ক'টাকে দুদিনেই মেরে ফেলবে। ঘি খেলে যে কুকুরের রেঁায়া উঠে যায়, আর নুন খেলে যে সর্ব্বাঙ্গে ঘা হয়, এ কথাটাও কি ঠাকুর জানে না?" মা বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন যে, "জান্‌বে কি করে? ঠাকুর ত এর আগে কখনো কুকুরের ভোগ রাঁধে নি। ওর রান্না কুকুর-বাবুদের যদি পছন্দ না হয় ত খুঁজে পেতে একজন কুকুরের বামন নিয়ে এসো।"

অনেক তল্লাসের পর একটি ১লা নম্বরের কুকুরের বামন পাওয়া গেল। জনরব, সে আগে লাটসাহেবের কুকুরদের খিদ্‌মত্‌গার ছিল। সে জাতে লালবেগী। লালবেগীরা যে কারা আর তাদের জাতব্যবসা যে কি, তা যিনিই বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা শুনেছেন, তিনিই জানেন। এ লোকটি একাধারে কুকুরের nurse এবং ডাক্তার। কুকুরজাতির ঔষধ-পথ্য সব তার নখাগ্রে। কুকুরের খানাকে যে রাতিব বলে, আর তা যে রাঁধতে হয় বিনা নুন ঝালে আর শুধু হলুদ দিয়ে—এ কথা আমরা প্রথম শুন্‌লুম তার মুখে। কুকুরের জন্য খানা পাকাবার হিসেব এই যে, তাতে কাঁচা মাংসের রূপ-গুণ সব বজায় থাকবে। আমাদের যেমন কুইনিন ও রেড়ীর তৈল, কুকুরদেরও নাকি হিং রশুন তেমনি সর্ব্বরোগের মহৌষধ।

বাবা তার পশ্বায়ুর্ব্বেদে পাণ্ডিত্য দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলেন, আর আমরাও ভারী খুসী হলুম, কিন্তু সে অন্য কারণে। সে কারণ যে কি, তা পরে বলছি। আর ভাইদের মধ্যে আমিই হয়ে পড়লুম তার মহাভক্ত, যদিচ কুকুর জানোয়ারটির সঙ্গে আমার কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল না; এবং তাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলুম। দাদা বলতেন, তিনি কুকুরের হাড়হদ্দ জানেন, তাই দাদার মুখে শুনে শিখেছিলুম যে, যে কুকুরের বিশটি নখ থাকে তার নখে বিষ থাকে। কুকুর সম্বন্ধে আমার এইটুকুমাত্র জ্ঞান ছিল। এখন বুঝি, দাদার এ জ্ঞান তাঁর যত্নতত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে যাই হোক, কুকুরের প্রতি আমার যে পরিমাণ অপ্রীতি ছিল, তার রক্ষকের প্রতি আমার সেই পরিমাণ প্রীতি জন্মাল।

৫

এ লোকটির নাম ছিল বীরবল। বাবা ছিলেন সেকালের হিন্দু কলেজের ছেলে, Captain Richardson-এর শিষ্য, অতএব মহা সাহিত্যভক্ত; তাই ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে বহু নামী লোকের সমাগম হত, কিন্তু এঁদের একজনেরও চেহারা আমার মনে নেই। মনে আছে একমাত্র বীরবলের। এর কারণ এঁরা অসামান্য ছিলেন গুণে, রূপে নয়। অপরপক্ষে বীরবল ছিল রূপে-গুণে অনুপম। অবশ্য সেই সব গুণে, যে সব গুণ ছোট ছেলেরা বুঝতে পারে। সে ছিল যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই নির্ভীক। ঘোড়ার বাগডোর সে একটানে ছিঁড়ে ফেলত। বড় বড় প্রাচীর সে অবলীলাক্রমে লাফিয়ে ডিঙ্গিয়ে যেত। তার উপর সে ছিল আশ্চর্য্য ঘোড়-সোয়ার। ঘোড়া—সে যতই বড় হোক না, যতই দুরন্ত হোক না, বীরবল তাকে এক বোতল বিয়ার খাইয়ে একলাফে তার

পিঠে চ'ড়ে বসত, আর ঘাড়ের উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে তার কাণে ক'সে ফুঁ দিত ; আর তখন সে ঘোড়া মরি-বাঁচি ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটত, কিন্তু বীরবলকে ফেলতে পারত না। আর তার রূপ! অমন সুপুরুষ আমি জীবনে কখনও দেখিনি। সে ছিল কালোপাথরের জীবন্ত Apollo। সে যখন প্রথমে এল, পরনে হলুদে-ছোপান ধুতি, মাথায় একই রঙের পাগড়ী, তার নীচে একমাথা কালো কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ঠোঁটে হাসি ও বগলে লালটুকটুকে একখানি হাত-আড়াই বাঁশের লকড়ি, তখন বাড়ী-সুদ্ধ লোক তার রূপ দেখে চমকে উঠলেন। মা আস্তে বললেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ! বাবা কিছু বলেন নি, কিন্তু বীরবলের রূপ যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তার প্রমাণ, মাস দুই পরে ঝগড়ু মেথর যখন বাবার কাছে এসে নালিশ করলে যে, বীরবল তার বউকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে, তখন বাবা আচ্ছা আচ্ছা ব'লে তাকে বিদেয় করলেন। মা'র মনে হল এটা অবিচার, এবং বাবাকে সে কথা বলাতে তিনি বললেন, "তুমিও যেমন, ওদের বিয়েই নেই, ত কে কার বউ। আর তা ছাড়া ঝগড়ুকে ত দেখেছ, বেটা বাঁদরের বাচ্ছা। আর লখিয়াকেও ত দেখেছ? কি সুন্দরী! সে যে ঝগড়ুকে ছেড়ে বীরবলের কাছে চ'লে যাবে, এ ত নিতান্ত স্বাভাবিক। রাধাকে কেউ ঘরে রাখতে পারবে না,—সে কৃষ্ণের কাছে যাবেই যাবে। এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম।" এ কথা শুনে মা চুপ ক'রে রইলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, বাবার রূপজ্ঞান তাঁর ধর্ম্মজ্ঞানকে চাপা দিয়েছিল। বীরবলের রূপ ছিল যে অসাধারণ, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, বাবার প্রচণ্ড ধর্ম্মজ্ঞানও সে রূপের আওতায় প'ড়ে গিয়েছিল ; কারণ, বাবা ছিলেন সেকালের একদম ইংরাজী-পড়া ঘোর moralist।

৬

বীরবলের রূপ আমি বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু করছিনে এই ভয়ে যে, পাছে তা কেতাবী হয়ে পড়ে। তাকে দেখেছিলুম ছেলেবেলায়, সুতরাং তার যে ছবি আজ আমার চোখের সমুখে খাড়া আছে, তার ভিতর স্মৃতির ভাগ কতটা আর কল্পনার ভাগই বা কতটা, তা বলতে পারিনে। তবে এ কথা সত্য, সে যার সম্পর্কে এসেছিল, তাকেই যাদু করেছিল—এমন কি, কুকুর ক'টাকেও। অকে দেখবামাত্রই কুকুরগুলো লেজ নাড়তে সুরু করত, আর Pluck ত একেবারে চিৎ হয়ে আহ্লাদে চার পা আকাশে তুলে দিত, অথচ দরকার হলে সে Pluckকে কড়া শাসন করতে কসুর করত না। সে তার পিঠে হাতও বোলাত, চাবুকও লাগাত।

তার চলাফেরা বলাকওয়ার ভিতর একটা খাতির-নদারৎ ভাব ছিল, যেটা আসলে তার প্রাণের স্ফূর্তির বাহ্যরূপমাত্র। সে ছিল সদানন্দ। আর প্রদীপ যেমন তার আলো চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, সেও তার মনের সহজ আনন্দ চারপাশে ছড়িয়ে দিত। এটা অবশ্য সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, যার মুখ দেখলেই মনটা দমে যায়। তার প্রকৃতি ছিল এ জাতের লোকের ঠিক উল্টো।

তার উপর ছোট ছেলেদের বশ করবার নানা বিদ্যে তার জানা ছিল। সে ঘুড়ি তৈরী করত চমৎকার। তার হাতের ঘুড়ি, কি ডাইনে কি বাঁয়ে কখন কান্নি মারত না। সুতো ছেড়ে দিলেই বেলুনের মত সোজা উপরে উঠে যেত। তাসের সুতোর জন্য যে চাই শীতল মাঞ্জা, আর লকের সুতোর জন্য খর, তা অবশ্য আমরা সবাই জানতুম। কিন্তু শীতল মাঞ্জার মাড় কতটা ঘন করলে আর খর মাঞ্জায় বোতলচুর কতটা মেশালে সুতো অকাট্য হয়, তার হিসেব জানত একা বীরবল। এমন কি বাণ্ডিলের সুতো

হলুদে ছুপিয়ে খর মাঞ্জার যোগে যে লকের সুতোকেও কেটে দিতে পারে, তার হাতে-কলমে প্রমাণ দিত বীরবল। তা ছাড়া চীনে-ঘুড়ির সে যে বর্ণনা করত, তা শুনে আমাদের মনে হ'ত, এবার মরে চীন দেশে জন্মাব। এ সব দিনের কথা এখন মনে করতে হাসি পায়। কিন্তু আমার পৃথিবীর সঙ্গে তখন প্রথম পরিচয়, যা দেখতুম আর যা শুনতুম, সবই অপূর্ব্ব ঠেকত।

৭

আমি ছিলুম তার favourite। বীরবল বলত, সে আমাকে তার সব বিদ্যে শেখাবে—অবশ্য বড় হ'লে। আমার অবশ্য তার কোন বিদ্যেই শেখবার লোভ ছিল না, লোভ ছিল শুধু সে সব দেখবার।

তাই সে আমাকে একদিন বলেছিল যে, সে আর তার ভাই-ব্রাদারীতে মিলে রাত্রিতে ঝাঁপান খেলবে। আমি যদি দেখতে চাই ত রাত দুপুরে একা তার বাড়ী গেলেই সব দেখতে পাব। অবশ্য বাবা মা আমাকে অত রাত্তিরে বীরবলের বাড়ী একা যেতে দেবেন না, তা আমি জানতুম; তাই যদিও ঝাঁপান খেলা দেখবার আমার অত্যন্ত লোভ ছিল, তবুও বীরবলের প্রস্তাবে রাজী হতে পারলুম না।

ঝাঁপান খেলা ব্যাপারটা কি জানেন?—আমাদের দেশে কেওড়া, মেথর, হাড়ি, ডোমরা বছরে একদিন সাপ খেলে—সাপের বিষদাঁত না ভেঙ্গে। সেই দিনই কে কেমন সাপুড়ে, তার পরীক্ষা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে রোজাদের। ঝাঁপান যেখানে খেলা হয়, সেখানেই এক আধজন মারা যায়। হাজার ওস্তাদ হোক্, আস্ত জাত সাপ নিয়ে খেলা ত ছেলেখেলা নয়! ঐ বিষদাঁত ছুঁলেই মরণ, যদি না রোজা ঝেড়ে সে বিষ নামাতে পারে। পুলিস এ খেলা খেলতে দেয় না, তাই গুণীর দল রাত দুপুরে ঘরে দুয়োর দিয়ে এ খেলা খেলে। যেদিন বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নেচে

লখিন্দরকে বাঁচিয়েছিল, সেইদিনই এ খেলা খেলতে হয়। বীরবল অবশ্য ব্যবসাদার সাপুড়ে ছিল না। কিন্তু যে কাষে বিপদ আছে, বীরবল হাসিমুখে গিয়ে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আর শুনেছি, সে সাপ খেলাতোও চমৎকার। সাপ যেদিক থেকে যে ভাবেই ছোবল মারুক না কেন, বীরবলের অঙ্গ কখনও ছুঁতে পারে নি।

বীরবল সে রাত্তিরে একটা প্রকাণ্ড খয়ে-গোখরো নিয়ে তার হাত-সাফাই দেখাবে, তাই সে আমাকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিল।

তার পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি যে, বীরবলকে রাত্তিরে সাপে কামড়েছে, সে এখন মরমর। এ সংবাদ নিয়ে এলেন ঝগড়ু; তিনিও নাকি ঐ দলে ছিলেন—তুবড়ি বাজাবার ওস্তাদ হিসেবে। অতি মাত্রায় মদ্যপানের ফলে ঝগড়ু সাপের সঙ্গে ইয়ারকি করতে গিয়েছিল, আর তাকে বাঁচাতে গিয়েই নাকি সাপের ছোবল বীরবলের হাতে পড়েছে। এ সংবাদ পেয়েই বাবা আমাদের এবং কুকুর ক'টাকে সঙ্গে নিয়ে বীরবলের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরা গিয়ে দেখি. তার ভাই-ব্রাদারীতে মিলে তাকে উঠোনে নামিয়েছে, আর মঙ্গলা খৃষ্টান বিড় বিড় ক'রে কি মন্ত্র পড়ছে ও বীরবলের গায়ে জলের ছিটে দিচ্ছে; আর লখিয়া সজোরে তার গা টিপছে—সাপের বিষ ড'লে নাবাবার জন্য। বীরবলের ভাই-ব্রাদারী থেকে থেকে বেহুলার যাত্রার ধুয়ো ধরেছে—"ও সে বাঁচবে না।" মঙ্গলা খৃষ্টান ওদিগের মধ্যে সবচাইতে নামী রোজা। সে বাবাকে সম্বোধন করে বল্লে, "হুজুর, বোধহয় রোগীকে আর বাঁচাতে পারলুম না,—যেমনি কামড়েছে, তেমনি যদি আমাকে ডাকত, তাহলে বিষ ঝেড়ে ঠিক নামিয়ে দিতুম। কিন্তু অন্য রোজারা তিন ঘণ্টা ধ'রে ঝাড়ফুঁক

করে যখন হাল ছেড়ে পালিয়ে গেল, তখন আমাকে খবর দিলে। এখন আর কোন মন্তরই লাগছে না, না চণ্ডীর না মেরির।"

বীরবলের দেখলুম সর্ব্বাঙ্গ একেবারে নীল হয়ে গিয়েছে, আর হাত-পা সব আড়ষ্ট। সে চোখ বুজে শুয়ে আছে আর তার নাক দিয়ে একটু একটু নিঃশ্বাস পড়্ছে। হঠাৎ বীরবল চোখ খুললে, আর আমার দিকে চেয়ে বললে, "বাবা, হাম চলতা, কুচ ডর নেই।" এই ক'টি কথা বলে সে আবার চোখ বুজলে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নিঃশ্বাসও বন্ধ হয়ে গেল। তখন দেখলুম সেই দেহ, সেই রূপ সবই রয়েছে, চ'লে গিয়েছে শুধু বীরবল।

পেলাগ্ ছুটে গিয়ে তার মৃতদেহ একবার শুঁক্লে, তারপরে চ'লে এল। দেখলুম তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আমার শুধু মনে হল যে, দিনের আলো নিভে গেল।

এখন আমি ভাবি, আমিও কি একদিন এই শেষ কথাটি বলে যেতে পারব—

"হাম চল্তা, কুচ ডর নেই।"

দিদিমার গল্প

(১)

এ গল্প আমি শুনেছি আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু নীলাম্বর মজুমদারের কাছে। তিনি শুনেছিলেন তাঁর দিদিমার কাছে। নীলাম্বরের বয়স যখন দশ, তখন তাঁর দিদিমার বয়স সত্তর, আর এই সময়ই দিদিমা নীলাম্বরকে এই গল্পটি বলেন। গল্পের ঘটনা যে সত্য, তার প্রমাণ নীলাম্বরের দিদিমা ছিলেন নিরক্ষর, অতএব কোন বই থেকে তিনি এ গল্প সংগ্রহ করেন নি। আর রামায়ণ মহাভারত ছাড়া অন্য বিষয়ে ছেলেদের গল্প বলা সেকালে মেয়েদের অভ্যাস ছিল না। তবে যদি কোনও বিশেষ ঘটনা তাঁদের মনে গাঢ় ছাপ রেখে যেত, - এমন যদি কিছু ঘটত যা তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারতেন না, তাহলে কখনো কখনো সে কথা ছেলেদের বল্‌তেন। এরকম ঘটনা একালে বোধহয় ঘটে না। কিন্তু আজ থেকে একশ' বছর আগে বাঙ্গালী সমাজে ঘটা অসম্ভব ছিল না। কি ধর্ম্মের কি অধর্ম্মের সেকেলে জোর একালে নেই।

নীলাম্বরদের গ্রামে একটি প্রকাণ্ড ভিটে পড়ে' ছিল, তার অধিকাংশই জঙ্গলে ভরা, আর একপাশে ছিল মস্ত একটা দীঘি। নীলাম্বর জানত যে তাদের মজুমদার বংশেরই একটা উচ্ছন্ন পরিবারের বাস্তুভিটের এগুলি ধ্বংসাবশেষ। এককালে নাকি ধনেজনে তারাই ছিল গ্রামের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। বাড়ীর বুড়ো চাকরদের কাছে শিশুকাল হতে নীলাম্বর এই পরিবারের ঐশ্বর্য্য ও পূজাপার্ব্বণ ক্রিয়াকর্ম্মের জাঁকজমক ধূমধামের কথা শুনে এসেছে। কি কারণে তাদের এমন দুর্দ্দশা ঘটল ও বংশলোপ

হল, তা জানবার জন্য নীলাম্বরের মহা কৌতূহল ছিল। সে একদিন তার দিদিমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন, "এ হচ্ছে ধর্ম্মের শাস্তির ফল।"

নীলাম্বর বল্‌লে, ব্যাপার কি হয়েছিল বলো।

(২)

দিদিমা বল্‌লেন,—

ঐ যে প'ড়ো ভিটে দেখছ, যা এমনি জঙ্গলে ভরে গেছে যে দিনের বেলায়ও বাঘের ভয়ে লোক সেদিক দিয়ে যায় না, আর যেখানে শুধু পাঁচ হাত লম্বা বন্দুক দিয়ে বুনোরা কখনো কখনো শূয়োর শিকার করে, ঐ ছিল তোমাদের পরিবারের সব চাইতে বড় জমিদার স্বরূপনারায়ণের বাড়ী। তিনি নবাব সরকারে চাকরি করে অগাধ পয়সা করেছিলেন। তা ছাড়া লোককে বিচার করা ও তাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতাও, গৌড়ের বাদ্‌শার সনন্দের বলে তাঁর ছিল বলে শুনেছি। যদিচ তাঁর রাজা খেতাব ছিল না, রাজার সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর ছিল, এমন কি মানুষকে কোতল করবারও। ঐ যে প্রকাণ্ড দীঘি দেখতে পাও, যা আজ পানায় বুজে গেছে, ওটি শুনতে পাই তাঁর কয়েদীদের দিয়ে কাটানো। আমি অবশ্য তোমাদের বাড়ীতে বিয়ে হয়ে এসে, বড় তরফের সৈন্যসামন্ত কিছুই দেখিনি, কারণ তখন আর নবাবের আমল নেই; হয়েছে ইংরাজের আমল। জমিদারেরা সব হয়ে পড়েছে শুধু জমির মালিক, প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নয়। তবে আমি যখন এ বাড়ীতে আসি, তখনও বড়তরফের খুব রব্‌রবা সময়, দাসদাসী পাইকবরকন্দাজ গুরুপুরোহিত আত্মীয়স্বজন নিয়ে প্রায় শতাধিক লোক ও-বাড়ী সরগরম করে রেখেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় ওখানে পাশা খেলার আড্ডা বস্‌ত

আর গ্রামের যত নিষ্কর্ম্মা বাবুর দল বড় বাড়ীতে গিয়ে জুটত, আর রাত দুটো তিনটের আড্ডা ভাঙলে ওখানেই আহার করে বাড়ী ফিরত। তারপর হত বাড়ীর মেয়েদের ছুটি। এরি নাম নাকি সেকেলে জমিদারী চাল।

(৩)

সে যাই হোক, আজও এদের ভিটে বজায় থাকত আর ও-পরিবারের মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা থাকত, যেমন তোমাদের আছে, যদি-না ঐ বংশে একটি কুলাঙ্গার জন্মাত। ভৈরবনারায়ণ স্বরূপনারায়ণের প্রপৌত্র। প্রকাণ্ড শরীর, ছোট্ট মাথা, টিয়েপাখীর মত ঠোঁট-ঢাকা নাক, বসা চোখ,—ভৈরবনারায়ণ ছিল মূর্ত্তিমান পাপ। সে ছেলেবেলা থেকে কুস্তি, লাঠিখেলা, তলওয়ার খেলা, সড়কি-চালানো ছাড়া আর কিছুই করে নি। ফলে তার শরীরে ছিল শুধু বল, আর ছিল না দয়ামায়ার লেশমাত্র। পূজার সময় সে পাঁঠাবলি, মেষবলি নিজহাতেই দিত, আর মেষবলির পর সে যখন রক্তে নেয়ে উঠ্‌ত, তখন তার কি আনন্দ, কি উল্লাস! গরীব লোকের উপরে তার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না। কারণে-অকারণে সে লোককে মারপিট করত, যেন ভগবান তাকে হাত দিয়েছেন আর পাঁচজনের মাথা ভাঙবার জন্য। গাঁ-সুদ্ধ লোক, গাঁ-সুদ্ধ কেন - দেশ-সুদ্ধ লোক তাকে ভয় করত, কারণ তার লোককে খুন করতেও বাধ্‌ত না। তার সঙ্গী ছিল লাল খাঁ, কালো খাঁ, সরিৎউল্লা ফকির, আর ময়নাল। চারজনেই নামজাদা লেঠেল, আর চারজনই বে-পরোয়া লোক। লাল খাঁ, কালো খাঁ ছিল জাতসিপাই, আর যার নুন খায় তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সরিৎউল্লা ফকির ছিল অদ্ভুত লোক! সে একবার সাত বৎসরের জন্য জেল খেটে বেরিয়ে হল ফকির। তার পরণে ছিল আলখাল্লা, আর গলায় ছিল নানা রঙের

কাঁচের মালা। এদানিক কোথাও কাজিয়া বাধলেই সে ফকিরী সাজ ছেড়ে লেঠেলি বেশ ধরত। আর ফকির সাহেব সড়কি ধরলেই খুন। ময়নাল ছিল নেহাৎ ছোকরা। বছর আঠারো বয়েস, সরিৎউল্লার সাগরেদ, আর অদ্ভুত তীরন্দাজ। তার তীর যার রগে লাগত, তারই কর্ম্মশেষ। আর তাঁর মন্ত্রী ছিল জয়কান্ত চক্রবর্ত্তী, ও-বাড়ীর কুল-পুরোহিত। তিনি ভৈরবনারায়ণের সকলরকম দুষ্কর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা ছিল যে, মজুমদার বংশে এতকাল পরে একটি দিক্‌পাল জন্মেছে;— এই ছোকরাটি বংশের নাম উজ্জ্বল করবে। এই লেঠেল ও পুরোহিত ছিল তার ইয়ার-বক্‌সি। এত যথেচ্ছাচারের ফলে যে সে জেলে যায় নি, তার কারণ তখন এ অঞ্চলে বিশ ক্রোশের ভিতরও একটি থানা ছিল না।

(৪)

তার উপর তিনি ছিলেন মহা দুশ্চরিত্র। ভৈরবনারায়ণের দৌরাত্ম্যে গেরস্তর ঝি-বৌদের ধর্ম্ম রক্ষা করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিল,— অবশ্য তাদের দেহে যদি চোখ পড়বার মত রূপ থাক্‌ত। আর কামার-কুমোর জেলেকৈবর্ত্তদের মেয়েদের গায়ে রঙ না থাক্, কখনো কখনো খাসা রূপ থাকে। তিনি কোথায় কার ঘরে সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে, দিবারাত্র তার সন্ধান নিজে করতেন আর অপরকে দিয়ে খোঁজ করাতেন, এবং ছলে-বলে-কৌশলে তাকে হস্তগত করতেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়ই ছিলেন তাঁর একসঙ্গে দূত আর মন্ত্রী। বাপের একমাত্র সন্তান, ছেলেবেলা থেকে যা-খুসী-তাই করেছেন, কেননা তাঁর যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দেবার কেউ ছিল না; তারপর দেহে যখন যৌবন এসে জুটলো, তখন ভৈরব-নারায়ণ হয়ে উঠলেন একটি ঘোর পাষণ্ড। ছেলের চরিত্রের পরিচয় পেয়ে ভৈরবনারায়ণের মা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, ছেলের কখন

কি বিপদ ঘটে। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় তাঁকে বোঝালেন যে, বনেদী ঘরের ছেলেদের এ বয়সে ওরকম ভোগতৃষ্ণা হয়েই থাকে, পরে সে আবার ধীর, শান্ত ও ঋষিতুল্য ধার্ম্মিক হ'য়ে উঠবে; যৌবনের চাঞ্চল্য যৌবনের সঙ্গেই চলে যাবে। তিনি কিন্তু এ কথায় বড় বেশী ভরসা পেলেন না, তাই খুঁজেপেতে একটি বছর চোদ্দ বয়সের ফিটগৌরবর্ণ মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। মহালক্ষ্মীর রূপের ভিতর ছিল রঙ্। ছোটখাট মানুষটি, নাক চাপা, চোখদুটি বড় বড়, কিন্তু রক্তমাংসের নয়—কাঁচের। তিনি ছিলেন গোঁসাইয়ের মেয়ে, জমিদারের নয়, নিতান্ত ভালমানুষ—যেন কাঠের পুতুল। আর তাঁর ভিতরটা ছিল কাঠের মতই অসাড়।

(৫)

এরকম স্ত্রীলোক দুর্দ্দান্ত স্বামীকে পোষ মানাতে পারে না, বরং নিরীহ স্বামীকেই বিগড়ে দেয়। বিয়ের পর কিছুদিনের জন্য ভৈরবনারায়ণের পরস্ত্রীহরণ রোগের কিছু উপশম হয়েছিল। তাঁর মা মনে করলেন, ওষুধ খেটেছে। কিন্তু মা'র মৃত্যুর পর থেকেই ভৈরবনারায়ণ আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করলেন। মহালক্ষ্মী তাঁর স্বামীর পরস্ত্রী-টানাটানির বিরুদ্ধে একদিনের জন্যও আপত্তি করেন নি, এমন কি মুহূর্ত্তের জন্য অভিমানও করেন নি। তাঁর মহাগুণ ছিল তাঁর অসাধারণ ধৈর্য্য। তাঁর ঐ বড় বড় চোখ দিয়ে কখনও রাগে আগুনও বেরোয় নি, দুঃখে জলও পড়েনি। তিনি ছিলেন হয় দেবতা, নয় পাষাণ। তবে তাঁর শরীরে যে মানুষের রক্ত ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহালক্ষ্মী দিদি ছিলেন ঘোর ধার্ম্মিক, দিবারাত্র পূজা-আর্চ্চা নিয়েই থাকতেন। কত চরিত্রের কত নামের ঠাকুরদেবতাকে যে তিনি ধূপদীপনৈবেদ্য দিয়ে পূজো করতেন, তার আর লেখাজোখা নেই। তাঁর কারবারই ছিল দেবতাদের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে

নয়। কে জানে দেবতা আছেন কি নেই, কিন্তু মানুষ যে আছে, সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। সুধু দিদি জানতেন—দেবতা আছে, আর মানুষ নেই। ফলে তাঁর স্বামীও হয়ে উঠলেন তাঁর কাছে একটি জাগ্রত দেবতা। যে লোককে পৃথিবীসুদ্ধ লোক ঘৃণা করত, একমাত্র তিনি তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। অবশ্য ভৈরবনারায়ণকে তিনি ধূপদীপ দিয়ে পূজো করতেন না, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করাই ছিল তাঁর স্ত্রীধর্ম্ম। স্বামীর সকল দুষ্কর্ম্মের তিনি নীরবে প্রশ্রয় দিতেন, অর্থাৎ তিনিও হয়ে উঠলেন সরিৎউল্লা ফকির ও পণ্ডিতমহাশয়ের দলের একজন। অবশ্য তিনি কখনো কোন বিষয়ে মতামত দেন নি, তার কারণ কেউ কখনো তাঁর মত চায়নি। তারপর যে ঘটনা ঘটল, তাতেই হল ও-পরিবারের সর্ব্বনাশ। সে ব্যাপার এতই অদ্ভুত, এতই ভয়ঙ্কর যে, আজও মনে করতে গায়ে কাঁটা দেয়।

(৬)

ভৈরবনারায়ণ একদিন বাড়ীর ভিতরে এসে দেখেন যে, পূজোর ঘরে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে বসে টাটে ফুল সাজাচ্ছে। তার বয়েস আন্দাজ ষোলো কি সতেরো। তার রূপের কথা আর কি বলব, যেন সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা। মেয়েটিকে দেখে ভৈরবনারায়ণ দিদিকে জিজ্ঞাসা করলেন ও কে? দিদি উত্তর করলেন, "অতসীকে চেনো না? ও যে সম্পর্কে তোমারই ভগ্নী, সর্ব্বানন্দ মজুমদারের ছোট বোন। যার জন্য দেশেবিদেশে বর খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু মনোমত কুলীন বর পাওয়া যাচ্ছে না। সর্ব্বানন্দ বলে, অমন রত্ন যার-তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি টাটে ফুল সাজাবার জন্য। ও যেমন সুন্দর শিব গড়ে, তেমনি সুন্দর টাট সাজায়।" এ কথা শুনে ভৈরবনারায়ণ বললেন, "তাহলে কাল

ওকে আমার জন্য শিব গড়তে আর ফুল সাজাতে বোলো।” দিদি বললেন, “আচ্ছা।”

অতসী পরদিন সকালে এসে, অতি যত্ন করে, অতি সুন্দর করে ভৈরবনারায়ণের পূজোর সব আয়োজন করলে। তারপর সেই মূর্ত্তিমান পাপ এসে পূজোর ঘরে ঢুকে, ভিতর থেকে দুয়োর বন্ধ করে দিলে। মহালক্ষ্মী দিদি বাইরে পাহারা রইলেন। ভৈরবনারায়ণ যখন ঘণ্টাখানেক পরে পূজো শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন দিদি ঘরে ঢুকে দেখেন যে অতসী বাসী ফুলের মত একদম শুখিয়ে গিয়েছে, আর শিব মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর ঘরময় টাটের ফুল-নৈবেদ্য সব ছড়ানো রয়েছে। দিদিকে দেখে অতসী অতি ক্ষীণস্বরে “আমাকে ছুঁয়োনা” এই কথা বলে, ধীরে ধীরে বড় বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে গেল। আর সেখানে গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে বিছানা থেকে সে আর ওঠেনি। এক ফোঁটা জলও মুখে দেয় নি। তিন দিন পরে অতসী মারা গেল। আর গ্রামের যেন আলো নিভে গেল। কারণ রূপে-গুণে হাসিতে-খেলাতে অতসী এ গ্রাম আলো করে রেখেছিল। সমস্ত মজুমদার পরিবারের মাথায় বজ্রাঘাত হলো, আর সকলের মনেই প্রতি-হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। সুধু মহালক্ষ্মী দিদির পূজা-আর্চ্চা সমান চলতে লাগল। স্বর্গের লোভ বড় ভয়ঙ্কর লোভ। এই লোভেই তিনি ভীষ্ম পতিব্রতা স্ত্রী হয়েছিলেন। সকলেই কিন্তু চুপচাপ রইলেন, সর্ব্বানন্দ কি করে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঝড় আসবার পূর্ব্বে আকাশবাতাসের যেমন থম্‌থমে ভাব হয়, এ গ্রামের ভাব সেইরকম হল।

(৭)

সর্ব্বানন্দ ছিলেন ভৈরবনারায়ণের ঠিক উল্টোপ্রকৃতির লোক। তিনি ছিলেন অতি সুপুরুষ—সাক্ষাৎ কার্ত্তিক; তার উপরে ঘোর সৌখীন।

গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাজু মুখ্‌খি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রার তদ্বির করতেই তাঁর দিন কেটে যেত। তিনি শ্যামা পাখীকে ছোট এলাচের দানা ঘিয়ে ভেজে নিজহাতে খাওয়াতেন। এলাচ খেলে নাকি শ্যামার গানের লজ্জত বাড়ে। তার উপরে তিনি দিবারাত্র গানবাজনা নিয়েই থাকতেন। আর নিজে চমৎকার সেতার বাজাতেন।

এর ফলে তিনি চারপাশের ছোটবড় সব জমিদারদের মহা প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। তিনি না থাকলে কারও নাচগানের মজ্‌লিস জমত না। বাই খেমটা মহলে তাঁর পশার নাকি একচেটে ছিল। সর্ব্বানন্দের কিন্তু এ দুর্ঘটনায় বাইরের কোন বদল দেখা গেল না। সেই হাসিমুখ সেই মিষ্টি কথা, সেই ভালমানুষী হালচাল। শুধু তিনি গানবাজনা ছেড়ে দিলেন। আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বড়নগরের বড় জমিদার কৃপানাথ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে থাকে প্রাণ যায় প্রাণ কবুল ক'রে দুই বন্ধুতে ভৈরবনারায়ণের ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হলেন। যে রাগ সর্ব্বানন্দের বুকে এতদিন ধোঁয়াচ্ছিল, তার থেকে আগুন জ্বলে উঠল। আর সেই আগুনে ভৈরবনারায়ণের সর্ব্বস্ব জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে গেল।

(৮)

ক্রমে ভৈরবনারায়ণ ও সর্ব্বানন্দের লেঠেলরা কাজিয়া সুরু করলে। ফলে এ গ্রাম হয়ে উঠল ভদ্রলোকদের নয়, লেঠেলের গ্রাম। গ্রামের সকলেই ছিলেন ভৈরবনারায়ণের বিপক্ষে, সুতরাং তাঁরা নানারকমে সর্ব্বানন্দের সাহায্য করতে লাগ্‌লেন। এমন কি আমাদের মেয়েদেরও কাজ হল সর্ব্বানন্দের জখ্‌মী লেঠেলদের শুশ্রূষা করা। আমি নিজের হাতেই কত না লেঠেলের সড়কির ঘায়ে ঘিয়ের সল্‌তে পুরেছি। এইতো গেল আমাদের অবস্থা। আর প্রজাদের দুঃখের কথা কি বলব। যত টাকার টান হতে লাগল, তাদের উপর অত্যাচার তত বাড়তে লাগল।

ভৈরবনারায়ণের প্রজারা জুলুম আর সহ্য করতে না পেরে সব বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তখন তিনি জমিদারী বন্ধক দিয়ে কেঁয়েদের কাছে ঋণ করতে সুরু করলেন। আর নিজে কাপ্তেন সেজে, লেঠেলদের দলপতি হয়ে লড়াই চালাতে লাগলেন।

তারপর একদিন রাত্তিরে সর্ব্বানন্দ ও কৃপানাথের লেঠেলরা ভৈরব-নারায়ণের বাড়ী আক্রমণ করলে। তখন বর্ষাকাল; সমস্ত দিন ছিপ্ ছিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ভৈরবনারায়ণ এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর দলবল সব গিয়েছিল সর্ব্বানন্দের মফঃস্বল কাছারি লুঠতে। তিনি বেগতিক দেখে ঘোড়ায় চড়ে খিড়কির দুয়োর দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সর্ব্বানন্দের লেঠেলরা বড় বাড়ীর দরজাজানালা ভেঙে, বাড়ীতে ধন রত্ন যা ছিল সব লুঠে নিল।

বাড়ীর একজন লোক পূজোর আঙ্গিনা দিয়ে পালাতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল। সর্ব্বানন্দের হুকুমে তাকে ধরে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেওয়া হল। লোকে বলে, এ বলি সর্ব্বানন্দ নিজহাতেই দিয়েছিলেন, লোকটাকে ভৈরবনারায়ণ বলে ভুল করে। এ কথা আমি বিশ্বাস করি; কারণ সর্ব্বানন্দ সৌখীন হলেও, তার বুকে ছিল পুরুষের তাজা রক্ত।

যে ব্যাপার সুরু হয়েছিল স্ত্রীহত্যায়, তার শেষ হল ব্রহ্মহত্যায়। এর পর ও-বংশ যে উচ্ছন্নে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্বামীর অধর্ম্ম ও স্ত্রীর ধর্ম্ম—এ দুয়ের এই শাস্তি।

(৯)

দিদিমার এ গল্প শুনেও নীলাম্বরের কৌতুহলের নিবৃত্তি হল না। সে জিজ্ঞাসা করলে, —"এর পর ভৈরবনারায়ণ কি করলেন?" দিদিমা বললেন —"এর পর ভৈরবনারায়ণ আর দেশে ফেরেন নি। লোকমুখে শুনেছি,

তিনি কিছুদিন পরে এক ডাকাতের দলে ধরা পড়ে' চিরজীবনের জন্য দায়মাল হয়েছেন,—লালখাঁ, কালোখাঁ, সরিৎউল্লা ফকির ও ময়নাল ছোকরা সমেত। দেশ যখন শান্ত হল, তখন আবার সদানন্দ মনের সুখে সেতার বাজাতে লাগলেন। যদিচ এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিল, আর তাঁর রূপলাবণ্য সব ঝরে পড়েছিল, —যেন শরীরে কি বিষ ঢুকেছে।

ভৈরবনারায়ণও গেলেন, বড়বাড়ীর সুখের পায়রাও সব উড়ে গেল। ঐ পোড়ো বাড়ীতে পড়ে' রইলেন শুধু মহালক্ষ্মী দিদি আর একটি পুরাণো দাসী। আর দিদি ঐ রাবণের পুরীতে একা বসে একমনে দিবারাত্র তুলসীকাঠের মালা জপ করতে সুরু করলেন। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, সর্ব্বানন্দের মনের আগুন একেবারে নেবেনি।

তবে সর্ব্বানন্দ ব্রহ্মহত্যা করে যে আবার স্ত্রীহত্যা করেনি, সে শুধু তোমার ঠাকুরদাদার খাতিরে। মহালক্ষ্মীকে সকল বিপদ থেকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। তোমার ঠাকুরদাদার ধারণা ছিল যে মহালক্ষ্মী পাগল —একেবারে বদ্ধ পাগল। দিদি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি হাতের শাঁখাও ভাঙেন নি, পাছে তাঁর স্বামীর অমঙ্গল হয়। ভৈরব-নারায়ণ যে কবে কোথায় মারা গেলেন, সে খবর আমাদের কেউ দেয় নি। তারপর মহালক্ষ্মী দিদি মারা যাবার পর যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাতেই এই পাঁচমহল বাড়ী একবারে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। আর সেখানে রয়েছে জঙ্গল, আর বাস করছে বাঘ ও শূয়োর। এরাই এখন ভৈরবনারায়ণের বংশরক্ষা করছে। ভাল কথা আশা করি মহালক্ষ্মী দিদি মরে স্বর্গে যায় নি, কেননা সেখানে গেলে যে অতসীর সঙ্গে দেখা হবে।

ভূতের গল্প

আমি কখনও ভূত দেখিনি, আর যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কি যে দেখেছেন, তা বল্‌তে পারেন না। তাঁদের কথা প্রায়ই অস্পষ্ট, তার কারণ, ভূত হচ্ছে অন্ধকারের জীব—তার কোনই কাটাছাঁটা রূপ নেই।

আমি একটি ভদ্রলোকের মুখে দিনদুপুরে রেলগাড়ীতে যে অদ্ভুত গল্প শুনেছি, তার প্রধান গুণ এই যে, ব্যাপার যা ঘটেছিল, তার একটা স্পষ্ট রূপ আছে।

আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে রেলরাস্তায় কন্‌ট্রাক্টরি কাযে ভর্ত্তি হই। ঐ ছিল আমার পৈতৃক ব্যবসা। আমি একবার Parlakimedi যাচ্ছিলুম। পারলাকিমেডি কোথায় জানেন ?– গঞ্জাম জিলায়। B. N. Rএর বড় লাইন থেকে Parlakimedi পর্য্যন্ত যে ফেঁকড়া-লাইন বেরিয়েছে, সে লাইন তৈরীর কন্‌ট্রাক্ট আমরাই নিই। আর তারই হিসেব-নিকেশ করতে সেখানকার রাজার ওখানে যাই।

গাড়ী যখন বিরহামপুর ষ্টেশনে পৌছল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা। ঐ এগারোটা বেলাতেই মাথার উপরে আর চারপাশে রোদ এমনি খাঁ খাঁ কর্‌ছিল যে, কলকাতায় বেলা দুটো তিনটেতেও অমন চোখ-ঝল্‌সানো রোদ দেখা যায় না। সে ত আলো নয়, আগুন। এরকম আলোয় পৃথিবীতে অন্ধকার বলেও যে একটা জিনিস আছে, তা ভুলে যেতে হয়।

গাড়ী ষ্টেশনে পৌছতেই একটি হৃষ্টপুষ্ট বেঁটেখাটো সাহেব এসে কামরায় ঢুক্‌লেন। তিনি যে একজন বড় সাহেব তা' বুঝলুম তাঁর উর্দ্দি-পরা চাপরাশীদের দেখে। দু'টি একটি বাবুও সঙ্গে ছিলেন, মাদ্রাজী কি উড়ে

—চিন্‌তে পারলুম না ; কিন্তু তাঁদের ধরণ-ধারণ দেখে বুঝলুম যে, তাঁরা হচ্ছেন সাহেবের আফিসের কেরাণী। কারণ তাঁরা সাহেবের জিনিষ-পত্র সব গাড়ীতে উঠল কি না দেখতে প্লাটফর্মময় ছুটোছুটি কর্‌ছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে কুলীদের পিঠে ও মাথায় চড়টা-চাপড়টা লাগাচ্ছিলেন। অবশেষে গাড়ী ছাড়ল। প্রথমে সঙ্গীটিকে দেখে আমার একটু অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। কারণ, তাঁর চেহারা ঠিক bull-dogএর মত—তার উপর তাঁর মুখটি ছিল আগাগোড়া সিঁদুরে লেপা। আমি ভাবলুম, রোদে তেতে মুখ এরকম লাল হয়েছে।

পাঁচ মিনিট পরেই তিনি একটি হুইস্কির বোতল খুলে একটি গেলাসে প্রায় আট আউন্স ঢেলে, তার সঙ্গে নামমাত্র সোডা সংযোগ ক'রে এক চুমুকে তা গলাধঃকরণ কর্‌লেন।

তারপর ঠোঁট চেটে আমাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন যে, "Will you have some?" আমি বল্‌লুম, "No, thank you." এ কথা শুনে তিনি বল্‌লেন, "There is not a drop of headache in a gallon of that. It is pucca Perth,—my native place."

আমি ও-হুইস্কি এত নিরীহ শুনেও যখন তাঁর অমৃতে ভাগ বসাতে রাজী হলুম না, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "Don't you drink?"

আমি বল্‌লুম, "I do, but I drink brandy."

এ মিথ্যে কথা না বললে, আমাকে তাঁর এক গেলাসের ইয়ার হ'তে হ'ত। আমার উত্তর শুনে তিনি বল্‌লেন, "Damned constipating stuff, bad for one's liver. However, don't drink too much."

এর পর তিনি আমাকে pucca Perthএর রসাস্বাদ কর্‌তে আর পীড়াপীড়ি করেন নি। নিজেই তাঁর মেজাজ ঝালিয়ে নিতে যখন-তখন

চুকঢাক আরম্ভ করলেন। আমি যখন বেলা দু'টোয় গাড়ী থেকে নেমে যাই, তখন তিনিও তাঁর খালি বোতল গাড়ীর জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন, আর একটি নতুন বোতলের মাথার রাঙতার পাগড়ী খুলতে ব'সে গেলেন।

লোকটা দেখলুম বেজায় মদ খায় বটে, কিন্তু বে-এক্তিয়ার হয় না। হুইস্কির প্রসাদেই হোক্, আর যে কারণেই হোক্, তিনি ক্রমে মহা বাচাল হয়ে উঠলেন ও আমার সঙ্গে গল্প সুরু কর্‌লেন ; অর্থাৎ সে গল্পের আমি হলুম শ্রোতা মাত্র, আর তিনি হলেন বক্তা।

আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বল্‌লেন যে, তিনিও এ অঞ্চলের একজন বড় সরকারী এঞ্জিনিয়ার। আর কার্য্যসূত্রে তিনি ওদেশে কি কি দেখেছেন আর তাঁর জীবনে কি কি অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে নানারকম খাপছাড়া ও এলোমেলো বক্তৃতা কর্‌লেন। দেখলুম, লোকটা শুধু মধুরসের নয়, মধুর রসেরও রসিক।

গঞ্জাম ছাড়িয়েই মাদ্রাজ। আর মাদ্রাজে নাকি দেদার অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে আছে। যদিচ পথে-ঘাটে যাদের দেখা যায়, তারা সব যেমন কালো, তেমই কুৎসিৎ। তবে যারা A. I. সুন্দরী, তারা সব অসূর্য্যম্পশ্যা। আর এই সব গুপ্তরত্নদের সন্ধান দিতে পারে, আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে শুধু P. W. D.র বড় বড় মাদ্রাজী কনট্রাক্টররা। সেই সঙ্গে তিনি বললেন যে-তুমি যখন একজন বাঙ্গালী কনট্রাক্টর, তখন তুমি যদি এ দেশে প্রেম কর্‌তে চাও ত তোমার তা কর্‌তে হবে ঐ সব কালো কুলী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে—সে প্রেমের ভিতর কোনও romance নেই, আর আছে নানারকম বিপদ। তারপর তাঁর অনেক প্রেমের কাহিনী শুনলুম। দেখলুম ভদ্রলোকের জীবনে যা যা ঘটেছে, সবই romantic। কিন্তু তার বর্ণনা বিষম realistic। সেই সবমাদ্রাজ মী

Helen Cleopatraদের কথা সত্য কিম্বা সাহেবের সুরাস্বপ্ন, তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু তার একটি গল্প সত্য বলেই মনে হ'ল, আর সেইটেই আজ বলব। গল্প সাহেব বলেছিলেন ইংরাজীতে, আর আমি বলব বাঙলায়। আমি ত আর Kipling নই যে, মাতালের মুখের ভূতের গল্প দা-কাটা ইংরাজীতে আপনাদের কাছে বলতে পারব।

এঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা

আমি যখন বিলেত থেকে চাকরী পেয়ে প্রথম এ দেশে আসি, তখন এ অঞ্চলের একটি জঙ্গুলে জায়গা হ'ল আমার প্রথম কর্ম্মস্থল।

কাজ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি পাকা রাস্তা তৈরী করা, আর সেই সঙ্গে আমার পূর্ব্বে যিনি এ কাজে ছিলেন, অর্থাৎ Mr. Rogers—তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতিমন্দির খাড়া করা। এখানে চাকরী করতে এসে নাকি অনেক এঞ্জিনিয়ার আর বাড়ী ফেরে নি—কবরের ভিতর চ'লে গেছে।

আমি কতক হেঁটে, কতক ঘোড়ায়, বহু কষ্টে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, চারপাশে শুধু ঘোর জঙ্গল, আর মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট নেড়া পাহাড়। আর যেখানে একটু সমান জমি আছে, সেখানেই দু'চার ঘর লোকের বসতি। আর এই সব স্থানীয় লোকেরাই জঙ্গল কাটে, মাটি খোঁড়ে, রাস্তায় কাঁকর ফেলে, আর দুরমুস দিয়ে পিটিয়ে তা দুরস্ত করে।

একটি দু'শ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর ছিল একটি P. W. D. বাংলো। সে বাংলোটির তিনকাল গেছে আর এককাল আছে। শুনলুম, সেখানেই আমাকে থাকতে হবে। সঙ্গে থাকবে আমার আদি-দ্রাবিড় চাকর-বাকর আর দু'জন স্থানীয় চৌকীদার। আমার বাসস্থান দেখে মন দমে গেল। কোথায় Perth আর কোথায় এই ভূতপ্রেতের শ্মশান!

সে যাই হোক, ঘরে সব জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাত্তিরে ডিনারের পর শুতে যাচ্ছি, এমন সময় একজন চৌকীদার এসে বললে যে, "শোবার আগে নাবার ঘরের দুয়োরটা ভাল ক'রে বন্ধ করবেন, ওঘরে একটি বাতি রাখবেন। এখানে কত-কিছুর ভয় আছে। আর রাত্তিরে কেউ যদি আপনার ঘরে ঢোকে ত আমাদের ডাকবেন। আমরা এই বারান্দাতেই শুয়ে থাকব।" শোবার ঘরে ঢোকবার আগে এমনিতেই আমার গা ছম্-ছম্ করছিল, তার উপর চৌকীদারের কথা শুনে গা আরও ভারি হয়ে উঠল। পা যেন আর চলে না! শেষটা ঘরে ঢুকে দুয়োর বন্ধ করলুম, তারপর বিছানার পাশে টেবিলের উপর একটি ছোট্ট ল্যাম্প ও revolver রেখে শুয়ে পড়লুম।

রাত দু'টো পর্য্যন্ত ঘুম হলো না, নানারকম ভাবনা-চিন্তায়—যে ভাবনা-চিন্তার কোনরূপ মাথা-মুণ্ডু নেই। তারপর যেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, অমনই একটা খট্‌খট্ আওয়াজ শুনে জেগে উঠলুম। প্রথমে মনে হ'ল, নাবার ঘরের কবাট হয় বাতাসে নড়ছে, নয় ইঁদুরে ঠেলছে। এ দেশে এক একটা ইঁদুর এক একটা বেড়ালের মত।

তারপর যখন দেখলুম শব্দ আর থামে না, তখন বিছানা থেকে উঠে revolver হাতে নিয়ে নাবার ঘরের দরজা খুলে দিলুম।

খুলেই দেখি, একটি স্ত্রীলোক। চমৎকার দেখতে, একেবারে নীল-পাথরের Venus। তার গলায় ছিল লাল রঙের পুঁতির মালা, দু'কাণে দু'টি বড় বড় প্রবাল গোঁজা, আর ডান হাতের কব্জায় একটি পুরু শাঁখের বালা। মাথার বাঁ দিকে চূড়ো বাঁধা ছিল, আর পরণে এক হাত চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ী। এ মূর্ত্তি দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সে আমাকে দেখে হেসে বললে, "তোমার ও পিস্তল দেখে আমি ভয়

পাই নে। গুলি আমার গায়ে লাগবে না। আমি কেন এখানে এসেছি জানো? তুমি যার বদলী এসেছ, আমি ছিলুম সেই রাজা সাহেবের রাজরাণী। এই হচ্ছে আমার ঘর, এই হচ্ছে আমার বাড়ী। আমি ঐ খাটে শু'তুম, আর ঐ চৌকীতে ব'সে কাঁচের গেলাসে বিলিতী আরক খেতুম। এক কথায় আমি রাণীর হালে ছিলুম। তারপর রাজা সাহেব একবার ছুটি নিয়ে বিলেত গেল, আর ফিরে এল মোমের পুতুলের মত একটি বিলিতী মেম নিয়ে। আর আমাকে দিলে সরিয়ে। সাহেব কিন্তু আমাকে মাস মাস খরচার টাকা পাঠিয়ে দিত।

তার মাসখানেক পর সে মেমটি একদিন হঠাৎ মারা গেল, অথচ তার কোনরকম ব্যারাম হয় নি। রাজা সাহেব তাঁর স্ত্রী কিসে মারা গেল, ভেবে পেলেন না। তারপর তাঁর চৌকীদার তাঁর কাণে কি মন্তর দিলে। তাতেই ঘটল সর্ব্বনাশ। ও বেটা ছিল আমার দুষমণ।

মেমটী মারা যাবার কিছুদিন পরে যখন দেখলুম সাহেব আর আমাকে ডেকে পাঠালে না, তখন আমি মনে করলুম, সাহেবের কাছে নিজেই ফিরে যাই। সে আমাকে আবার নিশ্চয়ই ফিরে নেবে। রাজা সাহেবকে আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমি ত জানতুম। দিনটে কুলী-মজুর নিয়ে কাটাতে পারলেও, রাত্তিরে আমাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

যে রাত্তিরে ফিরে এলুম এই নাবার ঘর দিয়ে, রাজা সাহেব তোমারই মত পিস্তল হাতে ক'রে এসে আমাকে দেখবামাত্রই গুলি করলে। আর ঐ হু'বেটা চৌকীদার আমার লাস জঙ্গলে ফেলে দিলে।"

এই কথা ব'লে সে ঘরের ভিতর তাকিয়ে বললে, "ঐ দেখ, রাজা সাহেব আসছে।" আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, খাটের পাশে ছ' ফুট লম্বা একটি ইংরাজ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। মরা মানুষের মত তার

ফ্যাকাশে রঙ, আর শরীরে আছে শুধু হাড় আর চামড়া। আর খাটে ধবধবে কাপড়ের মত সাদা একটি ইংরেজ মেয়ে মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আছে।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি আমাকে দেখে বললে, "ও পিশাচী এখনও মরে নি। ও এখনও বেঁচে আছে। ওই আমার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। নতুন সাহেব এসেছে শুনে এখানে এসেছে—আবার তার স্কন্ধে ভর করতে। আর ভরও নির্ঘাত করবে; কারণ, ও যাদু জানে। ওর হুইস্কির চাইতেও শাদা চামড়ার উপর টান বেশী। আর তুমি যদি ওর রূপের আগুনে পুড়ে মরতে না চাও—যেমন আমি মরেছি,—তবে এখনই ওকে গুলি কর।"

এ কথা শুনে blue Venus উত্তর করলে, "মিথ্যা কথা। আমি ওর স্ত্রীকে মারি নি। ওই আমাকে মেরেছে, তারপর নিজে মদ খেয়ে মরেছে।"...সাহেবটি আমাকে বললেন, "আমার কথা শোনো, ছোঁড়ো তোমার revolver—আর দেরী নয়।"

এই সব দেখেশুনে ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল, আর আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলুম। তাই আমি না ভেবেচিন্তে revolver ছুঁড়লম। সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কির বোতল মেঝেয় পড়ে চুরমার হ'য়ে গেল, আর বাতিও নিভে গেল।

গোলমাল শুনে চৌকীদাররা লণ্ঠন হাতে ক'রে হুড়মুড় ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। আমি তাদের বল্লুম যে, ঘরে চোর ঢুকেছিল—তাই আমি পিস্তল ছুঁড়েছি। তারা একটু হাসলে, তারপর সমস্ত বাড়ী আর তার চারপাশ খুঁজে কাউকেও দেখতে পেলে না। তখন বুঝলুম যে, রাত্তিরে আমার ঘরে যা হয়েছিল, সে ভূতের কাণ্ড। তারপর থেকেই আমি আর একা শুতে পারি নে, শুলেই ঐ blue Venus

চোখের সুমুখে এসে খাড়া হয়, আর আমি অমনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাই। অবশ্য এখন আর সে আসে না, কিন্তু তার স্মৃতিই আসে তার রূপ ধ'রে।"

এর পর সাহেব এই ব'লে তাঁর গল্প শেষ করলেন যে—

"শেষটা যাতে একা শুতে না হয়, তার জন্য বিয়ে করলুম। আমার স্ত্রী pucca Perth, ঘোর খৃষ্টান ও সম্পূর্ণ নির্ভীক। সে ভূতে বিশ্বাস করে না, করে শুধু ভগবানে। আর আমি ভগবানে বিশ্বাস করিনে, কিন্তু ভূতে করি। আমরা এঞ্জিনিয়াররা সব scientific men, ধর্ম্মের রূপকথা হেসে উড়িয়ে দিই, আর শুধু তাই বিশ্বাস করি, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। এই সব কারণে এ গল্প আমি মুখ ফুটে আমার স্ত্রীর কাছে বলতে পারি নি এই ভয়ে যে, আমার কথা সে হেসে উড়িয়ে দেবে।"

এঞ্জিনিয়ার সাহেবের গল্প শুনে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে—তুমি যা দেখেচ, তা হচ্ছে blue devil, D. T র প্রসাদে; কিন্তু তাঁর মুখে ভীষণ আতঙ্কের চেহারা দেখে চুপ ক'রে রইলুম। তারপরেই গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম।

আমি অবশ্য এই সাদা-কালো ভূতের মারাত্মক প্রণয়-কলহের রোমান্টিক কাহিনী বিশ্বাস করি নি; কিন্তু সে রাত্তিরে Parlakimedi-র ডাক-বাংলোর চৌকীদারকে আমার ঘরে শুইয়েছিলুম।